দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

জন্মাষ্টমী ও
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
— পৃঃ ৩১

শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে
বারবার কেন একইভাবে
গণ্ডগোল হচ্ছে? — পৃঃ ১৫

৭৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।। ২০ ভাদ্র, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

कुटुंब प्रबोधन

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৯ বর্ষ ১ সংখ্যা, ২০ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

৭ সেপ্টেম্বর - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

দেশবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিভাগ স্থানান্তরিত করতে হবে : 'গাও ভাঙনের গান' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মোদীজী কী সব বলছেন দিদি! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হিংস্র রাজনীতি, 'আরবান নকশাল' সিন্ডিকেট, মাও-বামেদের রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত ◻ রক্তিম দাশ ◻ ৮

সিজেপি নেতৃত্ব সম্পর্কে সোনম ওয়াংচুকের সাম্প্রতিক মন্তব্য অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

দিমাগি নকশাল : জাতির জীবনের ক্যানসার ◻ অম্লান কুসুম ঘোষ ◻ ১১

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও হত্যা অব্যাহত ◻ সন্তু গায়েন ◻ ১৩

শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার কেন একইভাবে গণ্ডগোল হচ্ছে? ◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ১৫

আজাদির বিকৃতি : বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উগ্রবাদ আধিপত্য, বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রবিরোধী ন্যারেটিভের উত্থান ◻ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ◻ ১৭

জন্মাষ্টমী ও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ◻ ড: সৌমিত্র মুখোপাধ্যায় ◻ ৩১

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমী ◻ ড: অনিলচন্দ্র দাস ◻ ৩২

মদনমোহন ও কোচবিহারের রাসমেলা ◻ অশোক কুমার ঠাকুর ◻ ৩৩

কৈলাসের নীরব প্রহরী নন্দীর অবিচল ধৈর্য ও সহনশীলতার কাহিনি ◻ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী ◻ ৩৪

মাওবাদী ও দিমাগি নকশালদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন চাই ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ৩৬

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : জাতীয়তাবোধের পূণ্যভূমি থেকে বাম-অতিবামপন্থী নৈরাজ্যের রক্তাক্ত বিবর্তন ইতিহাস ও আদর্শের মহাসংকট ◻ ডঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **অন্যরকম : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **স্মরণে : ৪৯**

স্বস্তিকা তার যাত্রাপথের ৭৮তম বর্ষ অতিক্রম করে এই সংখ্যা থেকে ৭৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই শুভলগ্নে স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

— স্বস্তিকা পরিবার

প্রকাশিত হবে
১৪ সেপ্টেম্বর
২০২৬

স্বস্তিকা

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশিত হবে
১৪ সেপ্টেম্বর
২০২৬

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গ্রামবাংলার মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক সংঘাত, মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং অতি সাধারণ মানুষের কথা তিনি তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজ সংস্কার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে এক নেপথ্য অনুপ্রেরণা ছিলেন তিনি।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় কথাসাহিত্যিকের জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর সাহিত্য-জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিশেষ ঘোষণা

রাজ্য সরকারের ১০০ দিন নিয়ে বিশেষ সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার গত ১৭ আগস্ট তাদের ১০০ দিন পূর্ণ করেছে। নির্বাচনী সংকল্পপত্রে বা তাদের প্রতিশ্রুতিতে যা যা ঘোষণা করেছিল তা তারা পূর্ণোদ্যমে বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে। তাতে মানুষের ভরসার স্থল নির্মাণ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত সরকার মানুষের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পেরেছে, স্বস্তিকার আগামী ২১ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সেবিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক। এছাড়াও থাকবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্বস্তিকার প্রতিনিধিকে দেওয়া একটি একান্ত সাক্ষাৎকার। মূল্য : ২৫ টাকা মাত্র।

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশিতম বর্ষে পদার্পণ করল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) একসঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শিক্ষাঙ্গনে রাষ্ট্রবিরোধীদের দৌরাত্ম্য

ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পুরোধাপুরুষ হইলেন শ্রীঅরবিন্দ। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু বরেণ্য বিপ্লবীর প্রেরণার উৎসও তিনি। বঙ্গভূমিতে স্বদেশী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনে উদ্যোগী হন শ্রীঅরবিন্দ। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মনমোহন ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণচন্দ্র রায় ও সুবোধচন্দ্র মল্লিকের সহায়তায় ১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠা করেন 'দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল' বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। দেশীয় পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং স্বদেশী ভাবধারায় শিল্পায়নের লক্ষ্যে পরিষদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। কলেজ ও ইনস্টিটিউটের একত্রীকরণের মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'।

ইহার পরবর্তী পর্যায়ে ভয়াবহ বাম ও অতিবাম রাজনীতির করালগ্রাসে নিক্ষিপ্ত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। একদা জাতীয়তাবোধের পীঠস্থানটি পরিণত হয় নিম্নরুচিসম্পন্ন, রাষ্ট্রবিরোধী রাজনীতির আখড়ায়। নকশালবাড়ি-কেন্দ্রিক চরম অরাজক ও হিংসাত্মক মাওবাদী আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন হয় বিপর্যস্ত। সেই লাল সন্ত্রাসে অগ্নিদগ্ধ হয় মহান বিপ্লবীদিগের স্মৃতিবিজড়িত, প্রখ্যাত প্রযুক্তিবিদদিগের ঐতিহ্যমণ্ডিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও। 'ছাত্র' নামধারী মাওবাদী দুর্বৃত্তদিগের আক্রমণে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন। সেই রক্তাক্ত অধ্যায়টি সুপ্রসিদ্ধ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অঙ্গে যেন কলঙ্ক লেপন করে। বাম ও অতিবাম রাজনীতির ধ্বংসাত্মক চরিত্রটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর সম্মুখে হয় উন্মোচিত। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা ক্ষমতাসীন হইবার পরই 'জুটা'র মাধ্যমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কায়েম হয় তাহাদের নিয়ন্ত্রণ। পরবর্তী চারটি দশকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র লালদুর্গে পর্যবসিত হয় নাই, রাষ্ট্রবিরোধীদের একটি কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল বা ছাত্রাবাসে নবাগত ছাত্রদের উপর ভয়াবহ র‍্যাগিং, ছাত্রীদের উপর যৌন নির্যাতন, মদ-গাঁজা-ড্রাগস্ ইত্যাদি নিষিদ্ধ মাদক সেবন, রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান ও অশ্লীল চিত্র সংবলিত দেওয়াল লিখন— সর্বপ্রকার অপরাধ ও কুকর্মের পুরোভাগে রহিয়াছে এই কুখ্যাতরা। তাহাদের পৈশাচিক মনোবৃত্তির শিকার হইয়াছেন অসংখ্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী। গোপনীয়তার অধিকারের দোহাই পাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নজরদারি ও সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের বিরোধিতায় তাহারা মুখর হইয়াছে। বহু বৎসর যাবৎ ভারতবিরোধী কার্যকলাপের আঁতুড়ঘরও হইয়া উঠিয়াছে বাম-জেহাদি অধ্যুষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়। তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সদা উদাসীন রহিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারপূর্বক জেহাদি ভাবধারাগ্রস্ত বাম-অতিবাম ছাত্রসংগঠনসমূহ ইতিপূর্বে ওঙ্কার প্রতীক ও ভারতের জাতীয় পতাকায় প্রকাশ্যে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে এবং অহরহ নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান তুলিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন পূর্বতন সরকারের নীতির কারণে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহু বৎসর যাবৎ কোনো নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নাই। গত ১৯ আগস্ট রাত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন বা ফেটস্-র সাধারণ সভা আহ্বান করে বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্র সংগঠন। জাতীয়তাবাদী ছাত্র-ছাত্রীরা এই গোপন, অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে বামপন্থীদের হস্তে তাঁহারা নিগৃহীত হন। এরপর তাহারা পালটা প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিলে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকে অশান্ত করিয়া তোলে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি। বিভিন্ন তথ্যকে ভুলভাবে পরিবেশনপূর্বক 'গেরুয়া গুন্ডামি'-র বিমর্শ উপস্থাপনে প্রয়াসী হয় একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম। এমতাবস্থায় আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিকট স্বস্তিকা পত্রিকা দাবি জানাইতেছে যে, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'-এর নামকরণ 'শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়' করা হউক। ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় আচার্য নন্দলাল বসু-অঙ্কিত চিত্রসমূহ অরবিন্দ ভবনের অভ্যন্তরে প্রদর্শিত হউক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঋষি অরবিন্দের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত হউক এবং তাঁহার পদতলে প্রতিদিন পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' গীত হউক। বরেণ্য মনীষীদিগের স্মৃতিবিজড়িত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিলম্বে রাহুমুক্তি ঘটাইতে, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন রুখিতে এবং রাজ্যের বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবুদ্ধ সমাজের অগ্রণী ভূমিকা আজ অতি আবশ্যক।

সুভাষিতম্

যদ্ যদেব প্রসক্তং হি বিতর্কয়তি মানবঃ।
অভ্যাসাৎ তেন তেনাস্য নতির্ভবতি চেতসঃ।।

অর্থঃ মানুষ যে বিষয় বা বস্তুর বিষয়ে বারবার চিন্তা করে, তার মন ধীরে ধীরে সেই দিকেই আকর্ষিত হওয়ার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

দেশবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিভাগ স্থানান্তরিত করতে হবে

‘গাও ভাঙনের গান’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর মতো বহু মনীষীর আশীর্বাদধন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখন দেশবিরোধী জেহাদি হায়নাদের বিচরণভূমি। তাদের পায়ের আওয়াজ প্রতিদিন রাজ্য জুড়ে শোনা যায়। কাশ্মীরের আজাদির আজগুবি দাবি থেকে শুরু করে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মুক্ত প্যালেস্তাইনের দাবি ওখানকার দেওয়ালে লেখা হয়। মূর্খ জেহাদিরা জানে না যে ভারতের কাছে প্যালেস্তাইন শত্রুদেশ নয়।

যাদবপুরের ভারত বিরোধী জেহাদি ঘর ভাঙতে হলে কয়েকটি বিভাগ আলাদা করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং আর হিউম্যানিটিজ বিভাগকে এক ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দুইয়ের ভেতর হিউম্যানিটিজ বিভাগকে যাদবপুর থেকে সরিয়ে রাজারহাট, সল্টলেক, নিউটাউন বা মধ্যমগ্রামে পাঠালেই জেহাদি কোমর ভেঙে যাবে। দুই বিভাগে দু'ধরনের ভারত বিরোধী বিদেশি শক্তি রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিঙে কট্টর মাওবাদী আর কিছু উগ্র নকশালপন্থী যারা এখন উদ্ভট ধারণায় চালিত হয়ে মনে করে যে বন্দুকের নল শক্তির উৎস। আর হিউম্যানিটিজ সংসদীয় বিদেশি বাম। জামানত জব্দ দল বিদেশি সিপিএম। বলা চলে অনেকটা শখ করে যাদের সমর্থকরা ওই মহাবিদ্যালয়ে বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। আর পরবর্তী জীবনে অধ্যাপক বা আমলা হয়ে ওঠেন।

ভারত বিরোধী জেহাদি আর বিদেশি বামপন্থার আঁতুড় যাদবপুর। সত্তরের দশকে এদের পূর্বসুরী নকশাল ভাগ্নেরা উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনকে পিছন থেকে ছুরি মেরে হত্যা করে। খুনি ধরা পড়েনি। এক সিপিএম নেতার দয়ায় সে বিদেশে পালিয়ে যায়। কিছুদিন আগে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। সেই শুরু। যার শেষতম নজির স্বপ্নদীপের মতো নিরীহ এক ছাত্রকে র‍্যাগিঙের নামে হত্যা করা।

রাজ্যজুড়ে সমস্ত সরকারি কর্মক্ষেত্রে কো-অর্ডিনেশন কমিটি বানিয়ে কার্ল মার্কসের নামে একদল সিপিএম করণিক রাজ্য প্রশাসন চালাত। ক্ষমতায় আসার পর তস্কর সরকার তা ভেঙে দেয়। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং থেকে তাদের সরকারি দপ্তর কাজ সরিয়ে তা হাওড়ার নবান্নে নিয়ে আসে। এরপর কমিটি উঠে যায়। বিদেশিরা বামেও ক্ষমতা থেকে চলে যায়।

১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, বেঙ্গল হিসেবে তৈরি হয় যাদবপুর। বিদেশি বামপন্থীদের কথায় একটি বিশেষ ধরনের জাত্যাভিমান থেকেই এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ তৈরি করা হয়। কেমব্রিজ ফেরত মেধাবী আইসিএস, পরবর্তীতে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে যাদবপুরের প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচন করা হয়। বন্দে মাতরম্ মামলায় গ্রেপ্তার হলে তিনি অধ্যক্ষ পদ থকে সরে দাঁড়ান। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকের চাপে ১৯১৫ সালের মধ্যেই শিক্ষা পরিষদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। এরপর রাজা সুবোধ মল্লিকের দেওয়া জমিতে ১৯৫৫ সালে প্রথমে কারিগরি বিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি হিসেবে গড়ে ওঠে যাদবপুর।

যাদবপুরকে পালটানোর সময় এসেছে। তাতে যত দেরি হবে জেহাদি শক্তি ততটাই জাঁকিয়ে বসবে। তাই এখনই এদের উপড়ে ফেলার সময়। দেওয়ালে ভারত বিরোধী লেখা মোছা শুরু হয়েছে। এরপর বামপন্থাকে চিরতরে মুছে দিতে হবে। পরিবর্তনের বড়ো সূচনাগুলির ভেতর যাদবপুরকে দু'ভাগ করা অবশ্যই রয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এ রাজ্যে আইন হিন্দু-মুসলমান সবার জন্য সমান। সাত দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বোঝানো হয়েছিল তাদের আলাদা আইন রয়েছে। সেই আইনের আওতায় থেকে তারা সরকারি ‘ইমিউনিটি’ বা রক্ষাকবচ পাবে।

প্রতিষ্ঠান বিরোধী-শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হতেই পারে। সমস্যা হয় যখন অল্প জানা রাহুল গান্ধীর মতো নেতারা মনুস্মৃতির ভুল ব্যাখ্যা করেন। ২০১৪ সালের ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর মাঝরাতে আলো নিভিয়ে পুলিশ দিয়ে যাদবপুরের ছাত্রদের লাঠিপেটা করে তস্কর সরকারের পুলিশ। নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে তারা উপাচার্যকে ঘেরাও করেছিল। শুরু হয় ‘হোক কলরব’। ২০১৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবিভিপি-র সম্মেলনে গেলে বাম ও নকশাল ছাত্র বিক্ষোভের মুখে পড়েন। ২০২৫-এর ১ মার্চ ওই ছাত্র বিক্ষোভের মুখে প্রাণ ভয়ে পালাতে গিয়ে তৎকালীন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কয়েকজন ছাত্রকে গাড়ি চাপা দেন। যাদবপুর ভাঙনের গান গাওয়ার সময় তাই আগত।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

মোদীজী কীসব বলছেন দিদি!

সর্ববিজ্ঞেষু দিদি,

শুনেছেন ভারতের অবস্থা। বিশ্বে নানা সঙ্কটের মধ্যেও ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত। এটা কি মেনে নেওয়া যায়! আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেটা না হয় ঠিক, কিন্তু মোদীজীও তো এগিয়ে যাচ্ছেন দিদি। আর আপনি তখন চুপ করে থাকবেন এটা মোটেও মানায় না। কিছু একটা বলুন। মোবাইল ফোন তো আছেই। সামনে রেখে একটা লাইভ করে ফেলুন না।

আপনি আজকাল যাঁকে খুব বড়ো নেতা ভাবেন সেই যে গান্ধী- বাড়ির ছেলেটা সবাই যাকে পাপ্পু বলে, সে তো দিন রাত 'ভারত গেছে, ভারত শেষ হয়ে গেছে' বলে কাঁদে। ছেলেটার সব ভালো, খালি ইতিহাসে কাঁচা। নিজের পরিবারের ইতিহাসটাই তৈরি নেই। ভারতের অগ্রগতির কথা জানিয়ে বিরোধীদের নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অবশ্য নাম না-করেই কটাক্ষ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুলকে। এসসিও সম্মেলনে যোগ দিয়ে কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেক থেকে যে ভিডিয়োবার্তা পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী সেটা দেখেছেন তো দিদি! দেখুন। একটি বার দেখে নিন। তার পরে সব ঝুটা হ্যায় বলে একটা ফেসবুক লাইভ চাই। আমি আগে থেকেই লাইক দিয়ে রাখলাম। জানি, আপনার লাইভে আজকাল হাহা রিঅ্যাক্ট বেশি পড়ে, কিন্তু সে পড়ুক। লাইভ একটা করেই ফেলুন।

দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) বৃদ্ধির হার প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি আর্থিক বছরের (২০২৬-'২৭) প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে জিডিপি। সেটা প্রত্যাশিত ৭.১ শতাংশের চেয়ে অনেকটাই বেশি। তার পরেই তো প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধির হার। এটা শক্তিশালী সংখ্যা। আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ল।' সঙ্কটের মধ্যেও ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গোটা বিশ্ব যুদ্ধে নিমজ্জিত। নানা সঙ্কটে বিপর্যস্ত পৃথিবী। সরবরাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেন) পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। কোভিড অতিমারির পর কোনো স্থিরতা নেই। তা সত্ত্বেও ভারত খুব দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।'

তার পরেই আপনার মতো 'হতাশাগ্রস্তদের' আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'ভারত ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে, দেশের কিছু মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত রয়েছেন। তাঁরা মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছেন।' এই সূত্রেই নাম না-করে রাহুলকে নিশানা করেন মোদীজী। রাহুলের 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে 'ঝুট (মিথ্যা) কি গুঞ্জ' বলেন

ভাইপো যে বলেছিল, খুব তাড়াতাড়ি চোখ দেখাতে হবে লন্ডনে। আদালতে ছোটাছুটি করে অনুমতিও পেল। কিন্তু গেল না কেন বলুন তো! চোখের সমস্যা কি মিটে গেছে!

প্রধানমন্ত্রী। দিদি, আজ রাহুলকে বলছে, কাল কিন্তু আপনাকেও বলতে পারেন মোদীজী। আত্মবিশ্বাস বাড়ছে কিন্তু। তবে দিদি, মোদীজী মনে হয়, আজকাল আর আপনাকে পাত্তা দেন না। আপনার দলের ভাইয়েদের মতো, এই রাজ্যের মানুষের মতো জাতীয় রাজনীতিতেও কেউ আজকাল পাত্তাই দেয় না আপনাকে। মোদীজী তো অনেক দূরের গ্রহ।

ভিডিয়োবার্তায় 'আত্মনির্ভর' ভারতের পক্ষে সওয়াল করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা যদি স্বদেশিয়ানা ও আত্মনির্ভরতার উপর বেশি জোর দিই, তা হলে স্বাধীনতার ১০০ বছরে আমাদের নবীন প্রজন্মের কাছে একটা উন্নত ভারত তুলে দিতে পারব।' আত্মনির্ভরতার কথা বলতে গিয়েই দেশবাসীকে তিনটি পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যদি অবসর কাটানোর জন্য যান, তা হলে বিদেশে যাবেন না। যদি বিদেশে গিয়ে বিয়ে করতে চান, সেটাও করা উচিত হবে না। আর প্রয়োজন না-হলে সোনা কিনবেন না।'

এই যে কথাগুলো সেটা নিয়েই ফেসবুক লাইভটা করুন। কে সোনা কিনবে, আর কে কিনবে না সেটা কি মোদীজী ঠিক করতে পারেন? না, জী বলতে হবে না। শুধু মোদীই বলুন। হতে পারে দেশের স্বার্থে সোনা না কেনাই উচিত কিন্তু সোনা বৌমার পিসিশাশুড়ি হিসেবে এটা আপনি তো বলতেই পারেন। প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ যেতে নিষেধ করছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ভাইপোর জন্য তো ছাড় আছে। সুপ্রিম কোর্ট দিয়েই রেখেছে।

এই রে! একটা উদ্ভট প্রশ্ন মাথায় এসে গেল দিদি। ভাইপো যে বলেছিল, খুব তাড়াতাড়ি চোখ দেখাতে হবে লন্ডনে। আদালতে ছোটাছুটি করে অনুমতিও পেল। কিন্তু গেল না কেন বলুন তো! চোখের সমস্যা কি মিটে গেছে! এটাকে, মানে এই প্রশ্নটাকে কিন্তু অন্য ভাবে নেবেন না প্লিজ। জাস্ট কৌতূহল। □

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হিংস্র রাজনীতি, ‘আরবান নকশাল’ সিন্ডিকেট, মাও-বামেদের রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত

রক্তিম দাশ

উচ্চশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে যে প্রতিষ্ঠানের নাম বিশ্বমঞ্চে প্রশংসিত হওয়ার কথা, সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আজ এক চরম রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা, রাজনৈতিক হিংসা এবং রাজ্য তথা দেশবিরোধী কার্যকলাপের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বামপন্থী, অতিবামপন্থী এবং প্রচ্ছন্ন মাওবাদী ভাবধারায় পুষ্ট কতিপয় ছাত্র সংগঠনের দখলদারির কারণে এই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানটির পরিবেশ দিন দিন বিষাক্ত হয়ে উঠছে। মুখে গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা এবং প্রগতিশীলতার ফাঁকা বুলি আওড়ালেও, বাস্তবে এই সংগঠনগুলির প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে প্রতিফলিত হয় ফ্যাসিস্তসুলভ একনায়কত্ব, অসহিষ্ণুতা এবং আইন- শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর নগ্ন মানসিকতা। যাদবপুরের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনা এবং তার পরবর্তী প্রচারযুদ্ধ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়— এটি মূলত ‘আরবান নকশাল’ বা শহরকেন্দ্রিক মাওবাদী নেটওয়ার্কের এক গভীর এবং পরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ।

(১) ভিডিয়ো নিয়ে মিথ্যাচার, তথ্য বিকৃতি ও ‘ভিক্টিম কার্ড’ খেলার নোংরা রাজনীতি ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি গোলমালের পর একটি নির্দিষ্ট নকশা বা প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক ঘটনাতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সংঘর্ষের পরেই সোশাল মিডিয়া এবং নিজেদের অনুগত কিছু সংবাদমাধ্যমে আংশিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এডিট করা ভিডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের ‘নির্যাতিত’ হিসেবে তুলে ধরার এক সস্তা ও ঘিনঘিনে নাটক শুরু হয়েছে।

(২) ঘটনার সত্য গোপন ঃ এদিনের সংঘর্ষের আসল উৎস কী ছিল? সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাধারণ সভায় (GB Meeting) কীভাবে অন্য মতাবলম্বীদের ওপর প্রথম চড়াও হওয়া হয়েছিল এবং কোন উসকানির মাধ্যমে পরিবেশ উত্তপ্ত করা হয়েছিল— সেসব সিসিটিভি ও নিরপেক্ষ ভিডিয়ো ফুটেজ থেকে বাম-মাওবাদী ক্যাডাররা কৌশলে আড়াল করতে চায়।

(৩) একতরফা ন্যারেটিভ ঃ নিজেদের অপরাধ ঢাকতে এবং জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়াতে তারা কেবল প্রতিপক্ষের প্রতিরোধের দৃশ্যটুকু কেটে-ছেঁটে প্রচার করে। নিজেদের উসকানিমূলক হিংসাকে আড়াল করে নিজেদের ‘আক্রান্ত’ দাবি করার এই হিড়িক বামপন্থীদের পুরনো কৌশল। একেই বলা হয় ‘ভিকটিম কার্ড’ রাজনীতি— যেখানে অপরাধী নিজেই নিজেকে ভুক্তভোগী দাবি করে সহানুভূতি কুড়োনোর চেষ্টা করে।

> বাম ও অতিবাম সংগঠনগুলির সাজানো নাটক ও অপপ্রচারের আসল মুখোশ আজ দেশবাসীর সামনে খুলে গেছে। শিক্ষার আঙিনাকে হিংসা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের আখড়া বানানোর এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে কঠোর ও চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় এসেছে।

(৪) ‘আরবান নকশাল’ সিন্ডিকেটঃ প্রগতির মুখোশে মাওবাদী ভাবধারার বিষবৃক্ষ ঃ ‘আরবান নকশাল’ বা শহরকেন্দ্রিক অতি-বামপন্থী মানসিকতা কীভাবে একটি শিক্ষাঙ্গনকে ভেতর থেকে ঘুণপোকার মতো ফোঁপরা করে দেয়, যাদবপুর তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। জঙ্গলমহল কিংবা দণ্ডকারণ্যের সশস্ত্র মাওবাদী আন্দোলনের যে হিংসাত্মক দর্শনে বিশ্বাসী গোষ্ঠীগুলো রয়েছে, তাদেরই মগজধোলাই করা নেতারা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ঘর আর করিডোর দখল করে বসে আছে।

(৫) শিক্ষাঙ্গনে মতাদর্শের বিষবাষ্প ঃ SFI– FETSU– DSO কিংবা বিভিন্ন অসংগঠিত অতি-বাম ছাত্রফ্রন্টগুলি সাধারণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম থেকেই একধরনের রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তাধারায় অভ্যস্ত করে তোলে। প্রগতিশীলতার মোড়কে তাদের শেখানো হয় দেশের সংবিধান, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে। একটি মাওবাদী ছাত্র সংগঠন থেকে প্রচারিত হয় একটি পত্রিকা, নাম— ‘ছাত্রফৌজ’। এইসব পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায় থাকে রাষ্ট্রবিরোধিতা ও লাল সন্ত্রাসের বিষবাষ্প।

(৬) সশস্ত্র লড়াইয়ের মানসিক প্রস্তুতি ঃ দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে মিছিলের স্লোগান— সব জায়গাতেই এক অদৃশ্য হিংসার প্ররোচনা থাকে। এরা কলম ও বইয়ের বদলে ছাত্রদের হাতে মতাদর্শগত হাতিয়ার তুলে দেয়, যা আদতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করার মাওবাদী অ্যাজেন্ডারই এক শহুরে রূপ।

(৭) বাক্‌স্বাধীনতার নামে একনায়কত্ব ও ভিন্নমতের ওপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ঃ যাদবপুর ক্যাম্পাসে সবচেয়ে বড়ো প্রহসন হলো এদের ‘বাক্‌স্বাধীনতা’র দাবি। এদের অভিধানে বাক্‌স্বাধীনতা মানে কেবল নিজেদের রাষ্ট্রবিরোধী কথা বলার অধিকার; কিন্তু অন্য কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক মতাদর্শের মানুষ সেখানে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে গেলেই নেমে আসে চরম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

(৮) ভিন্নমত সহ্য না করার ব্যাধি ঃ

কোনো ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাত্র সংগঠন যদি গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রচার চালাতে চায়, তবে তাদের ওপর দলবদ্ধ আক্রমণ চালানো হয়। তাদের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা, মাইক কেড়ে নেওয়া এবং শারীরিক নিগ্রহ করা এদের কাছে অত্যন্ত সাধারণ বিষয়।

(৯) সোশ্যাল ফ্যাসিস্ত মানসিকতা ঃ এরা একদিকে নিজেদের 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতার রক্ষক' বলে দাবি করে, আর অন্যদিকে ক্যাম্পাসে অন্য সব মতকে গায়ের জোরে স্তব্ধ করে দেয়। এটি গণতন্ত্র নয়, এটি হলো সরাসরি রেড ফ্যাসিজম্।

(১০) দেশের সার্বভৌমত্বের অবমাননা ও গ্রাফিতির নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ঃ যাদবপুরের দেওয়ালে দেওয়ালে যা লেখা থাকে, তা কোনো সভ্য দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিত্র হতে পারে না। প্রগতির নামে সেখানে যে ধরনের গ্রাফিতি আঁকা হয়, তা সরাসরি দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতির ওপর আঘাত হানে।

(১১) ভারতীয় মহাপুরুষ ও জাতীয় প্রতীকের অবমাননা ঃ দেশের মহাপুরুষ, জাতীয় পতাকার প্রতীক কিংবা সাংবিধানিক পদগুলিকে নিয়ে কটূক্তি করা এবং চূড়ান্ত অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করা এদের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

(১২) বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান ঃ কাশ্মীরের আজাদি থেকে শুরু করে দেশের অখণ্ডতা বিরোধী নানা স্লোগান ক্যাম্পাসের হোস্টেল ও ডিপার্টমেন্টের দেওয়ালে প্রকাশ্যে শোভা পায়। সাধারণ করদাতাদের টাকায় পরিচালিত একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে কীভাবে দেশেরই বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এবং দেশকে টুকরো টুকরো করার স্বপ্ন দেখা হয়, তা এক বড়ো প্রশ্ন।

(১৩) সম্পদ ধ্বংস ও আইন-শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের সংস্কৃতি ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সংঘর্ষে অগ্নিসংযোগ, প্রধান ফটকের প্রতীকী ফলক ভাঙচুর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার যে দৃশ্য দেখা গেছে, তা কোনো ছাত্র আন্দোলনের লক্ষণ নয়— তা হলো অপরাধমূলক গুন্ডামির নামান্তর।

(১৪) জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয় ঃ সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকায় তৈরি এই পরিকাঠামো বাম ও অতিবাম ক্যাডারদের তাণ্ডবে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ল্যাবরেটরি, অডিটোরিয়াম বা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশকে নিজেদের রাজনৈতিক আখড়ায় পরিণত করে রাখা হয়েছে।

(১৫) পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতি অবজ্ঞা ঃ কোনো অপরাধ ঘটলে বা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে পুলিশকে ভেতরে ঢুকতে না দেওয়া এদের এক ধরনের কৌশল। 'ক্যাম্পাসের স্বায়ত্তশাসন' বা 'Autonomy'-র বাহানা দিয়ে এরা বস্তুত অপরাধীদের আড়াল করার এক সুরক্ষিত ডেরা তৈরি করে রেখেছে।

(১৬) সিসিটিভি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিরোধিতা—অন্ধকারের অপরাধ আড়াল করার চক্রান্ত ঃ ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো বা পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার মতো সামান্যতম প্রশাসনিক নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপে কেন এই বাম-মাওবাদী সংগঠনগুলির এতো আপত্তি? উত্তর অত্যন্ত পরিষ্কার ও বিপজ্জনক।

(১৭) অপরাধ আড়ালের কৌশল ঃ সিসিটিভি থাকলে কে কাকে মারধর করছে, কারা বাইরে থেকে সমাজবিরোধী এনে ক্যাম্পাসে তাণ্ডব চালাচ্ছে, কারা রাতে অসামাজিক কাজ করছে তার সব প্রমাণ ধরে পড়ে যাবে।

(১৮) আইনহীনতার পরিবেশ বজায় রাখা ঃ এরা চায় বিশ্ববিদ্যালয় যেন এমন এক অন্ধকার এলাকা (No-Go-Zone) হয়ে থাকুক, যেখানে দেশের কোনো আইন খাটবে না। কেবল নিজেদের বানানো মাওবাদী নিয়ম অনুযায়ী পুরো ক্যাম্পাস পরিচালিত হবে। নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপের বিরোধিতা আসলে কোনো অধিকার রক্ষার লড়াই নয়— এটি নিজেদের অপরাধমূলক সাম্রাজ্য বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা।

(১৯) শিক্ষাঙ্গনের ভবিষ্যৎ ধ্বংস এবং নবীন ছাত্রদের মগজধোলাই ঃ যে শিক্ষার্থীরা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে, নিজেদের মেধা ও পরিশ্রমের জোরে যাদবপুরে ভর্তি হতে আসে, তাদের জীবনের প্রথম দিন থেকেই এই বিষাক্ত রাজনীতির শিকার হতে হয়।

(২০) জোরজবরদস্তি ও র‌্যাগিঙের রাজনৈতিক রূপ ঃ নবীন ছাত্রদের হোস্টেল ও ক্যাম্পাসে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের মিছিলে যেতে বাধ্য করা হয়। যারা এই বিষাক্ত সংস্কৃতিতে যোগ দিতে চায় না, তাদের একঘরে করে দেওয়া হয়।

(২১) ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের চক্রান্ত ঃ পড়াশোনা, গবেষণা ও কর্মসংস্থানের উপযুক্ত পরিবেশ নষ্ট করে তরুণ প্রজন্মকে এক হতাশাজনক রাজনৈতিক আবর্তে ঠেলে দেওয়াই এদের লক্ষ্য। ফলে অনেক সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রী কেবল এই রাজনীতির বলি হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ শেষ করে ফেলছে।

আরবান নকশাল ও বাম অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ দরকার ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক হিংসা এবং তার পরবর্তী অপপ্রচার কেবল একটি স্থানীয় প্রশাসনিক সমস্যা নয়; এটি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেতর থেকে পঙ্গু করার এবং দেশকে দুর্বল করার এক বিপজ্জনক মাওবাদী চক্রান্ত।

শিক্ষাঙ্গন হলো জ্ঞানচর্চা, উদ্ভাবন এবং ভবিষ্যতের নাগরিক গড়ার জায়গা। সেখানে প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে দেশের অখণ্ডতাবিরোধী মনোভাব এবং গায়ের জোরের রাজনীতি আর একদিনও সহ্য করা যায় না। যাদবপুরকে এই চরমপন্থী মানসিকতা, নোংরা মিথ্যাচার এবং আরবান নকশালদের রাজনৈতিক বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন—

(১) নিরপেক্ষ তদন্ত ঃ ভাইরাল ভিডিও ও সিসিটিভি ফুটেজের ডিজিটাল ফরেনসিক পরীক্ষা করে মূল হিংস্র উসকানিদাতাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করতে হবে।

(২) আইনি শাস্তি ঃ ছাত্র পরিচয়ের আড়ালে থাকা অপরাধী ও বহিরাগত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা (এফআইআর ও গ্রেপ্তার) নিতে হবে।

(৩) প্রশাসনিক কড়াকড়ি ঃ ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা জোরদার করা, পুরো সিসিটিভি নজরদারির আওতায় আনা এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভীতিমুক্ত পরিবেশে পড়াশোনার অধিকার সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

বাম ও অতিবাম সংগঠনগুলির সাজানো নাটক ও অপপ্রচারের আসল মুখোশ আজ দেশবাসীর সামনে খুলে গেছে। শিক্ষার আঙিনাকে হিংসা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের আখড়া বানানোর এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে এখনই কঠোর ও চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় এসেছে। □

সিজেপি নেতৃত্ব সম্পর্কে সোনম ওয়াংচুকের সাম্প্রতিক মন্তব্য অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে

সম্প্রতি ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র নেতা অভিজিৎ দিপকে, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা এবং তাদের বিদেশি সংযোগ প্রসঙ্গে সোনম ওয়াংচুক মন্তব্য করেন— 'অভিজিৎ দিপকে, সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আমি তাদের মূল্যায়ন করেছি। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি না যে ভবিষ্যতে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হবে না। তারা অবশ্যই কোনো সাধুসন্ত নন, যারা পুরোপুরি নির্লোভ।'

আজ থেকে ৩ বছর আগে সোনম ভাই সস্ত্রীক দেখা করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে এবং ধর্মেন্দ্রজীকে দেশের সেরা শিক্ষামন্ত্রী আখ্যা দেন। এর মধ্যে এফসিআরএ আইনের কড়াকড়িতে বন্ধ হয় তার দু'টি এনজিও। গত মার্চ মাসে সংসদে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল আসতেই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন সোনম ভাই। নিট (ইউজি) প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদে সিজেপি-র আন্দোলনে যোগ দেন তিনি। শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের দাবিতে অনশনে বসেন। ধর্মেন্দ্রজী পদত্যাগ করলে আন্দোলন থেকে সরে আসে সিজেপি। তার কিছুদিন পর সিজেপি নেতৃত্ব সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেন সোনম ওয়াংচুক। সোনম ভাইকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়— শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার-সহ লাদাখের মতো অনগ্রসর এলাকা উন্নয়নে তার প্রস্তাবিত বিকল্প মডেল কী? পরিবেশে কোনো পরিবর্তন না এনে কীভাবে লাদাখবাসীকে সড়ক, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব? ২০১৯-এর আগে কেন কখনও লাদাখকে পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতির দাবি রাখেননি তিনি? এসটি (তপশিলি উপজাতি) সংরক্ষণ সংক্রান্ত দাবিদাওয়া তিনি কেন রাখেননি জম্মু-কাশ্মীরের শাসক মুফতি বা আব্দুল্লা পরিবারের কাছে? সোনম ওয়াংচুককে বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও পরিবেশবিদ বলে দাবি করে থাকে একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম। একটা পেটেন্ট তারা দেখাক সোনম ওয়াংচুকের নামে। কোন বিজ্ঞানের সাধনা তিনি করেছেন? শেষ প্রশ্ন--- আজ থেকে ৩ বছর আগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যে সোনম ভাই কী দেখেছিলেন যে এমন প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন 'জাতীয় শিক্ষানীতি -২০২০'-র বিষয়ে তিনি সেদিন কেন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছিলেন? আসলে সমস্যার সূত্রপাত এই বছর মার্চ মাসে। নতুন এফসিআরএ বিল আসছে, যার ফলে বিদেশ থেকে আসা টাকাপয়সা কোথায়, কেন খরচ হচ্ছে তা এনজিওগুলিকে দেখাতে হবে।

'থ্রি ইডিয়ট্স্' সিনেমার মুখ্য চরিত্র 'র‍্যাঞ্চো'র সঙ্গে অনেকে লাদাখের সোনম ওয়াংচুকের তুলনা করে থাকেন। সিনেমার র‍্যাঞ্চো যেমন গরিবের সন্তান ছিলেন বাস্তবের সোনম ভাই কিন্তু তা নন। সোনম ভাইয়ের পিতা একজন কোটিপতি কংগ্রেসি বিধায়ক ছিলেন। সিনেমার র‍্যাঞ্চোর কয়েক'শো পেটেন্ট ছিল— সেই অর্থে তিনি তাঁর স্কুল পরিচালনা করতেন। সোনম ভাইয়ের কিন্তু একটাও পেটেন্ট নেই। তার সংস্থা ও স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় পুরো অর্থই আসে বিদেশ থেকে। তাই নতুন এফসিআরএ বিলে সমস্যায় পড়েছেন সোনম ভাই। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব দাখিল করতে না পারলে বিদেশ থেকে অর্থ নেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে তাকে। বন্ধ করতে হবে এনজিও। তখন নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের তাকে বলতে হবে যে, তার কাছে কোনো পেটেন্ট নেই। তার আয়ের উৎস— বিদেশ থেকে ভিক্ষা। তিনি সিনেমার নায়ক 'রণছোড়দাস চাঁচড়' নন। তিনি সোনম ওয়াংচুকই। তিনি একজন বিধায়ক-পুত্র, যিনি এনআইটি (শ্রীনগর) থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলেও 'ইঞ্জিনিয়ারিং' নিয়ে কোনোদিন কাজ করেননি। জীবনে কোনোদিন আইআইটি, দিল্লিতেও পা রাখেননি।

২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা বিলোপ করার আগে জম্মু-কাশ্মীর ভারতের একমাত্র রাজ্য ছিল যেখানে এসসি-এসটি সংরক্ষণ ছিল না। ৬০ বছর বয়সি সোনম ভাই কিন্তু একবারও তার কোনো প্রতিবাদ করেননি। লাদাখে ছিল না উন্নতমানের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। ছিল না কোনো মেডিক্যাল কলেজ। সোনম ভাই এবিষয়ে কোনোদিন সোচ্চার হননি। গত কয়েক বছরে পার্বত্য অঞ্চলে একের পর এক টানেল তৈরি করে লাদাখের মানুষের যাতায়াতের সুবিধা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীজীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। রাস্তাঘাটের হাল ভালো করে দেওয়া হয়েছে। প্রচুর রেল প্রকল্প পাওয়ার ফলে লাদাখের পর্যটন আয় বাড়বে বহুগুণ। জীবাশ্ম-জ্বালানি নির্ভরতা কাটিয়ে কার্বন-নিঃসরণ শূন্য লাদাখ তৈরি করতে জোর দেওয়া হচ্ছে জলবিদ্যুৎ ও সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে। স্থাপন করা হয়েছে অনেকগুলি স্কুল। লাদাখের ১০০ শতাংশ ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে গিয়েছে— ১০ বছর আগে যা ছিল ৫ শতাংশ। কাশ্মীরি মুসলমানদের শাসনে লাদাখের প্রতি যে পরিমাণ বঞ্চনা করা হয়েছে— তার কোনো প্রতিবাদ কোনোদিন করেননি সোনম ওয়াংচুক। আজ যখন লাদাখ জুড়ে উন্নয়নযজ্ঞ শুরু হয়েছে, তখন প্রতিবাদমুখর হয়েছেন সোনম ভাই। চীনা প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর হয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের দুর্বুদ্ধিজীবীরা হয়তো কিছু না জেনে প্রকাশ্যে বা সামাজিক মাধ্যমে ককরোচ জনতা পার্টি বা সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলন সমর্থন করছেন, নতুবা তারা অনেক আগেই ভারত-বিরোধী শক্তির হাতে বিক্রি হয়ে গিয়েছেন। এদের থেকে রাজ্যবাসীর সমূহ সাবধানে থাকা প্রয়োজন।

দিমাগি নকশাল : জাতির জীবনের ক্যানসার

দিমাগি নকশালরা হলো জাতির জীবনের ক্যানসার। এরা দেশের ভেতরে থেকেই গোটা দেশকে শেষ করে দেবার ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

অম্লানকুসুম ঘোষ

নবযুগের নবগঠিত ভারতবর্ষ যখন উন্নতির শীর্ষশিখর জয়ের জন্য যাত্রা শুরু করেছে তখন তার যাত্রাপথের প্রধান বাধা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে একশ্রেণীর মানুষ যাদেরকে এক কথায় বলা হয় দিমাগি নকশাল বা আরবান নকশাল। দিমাগি নকশাল বা আরবান নকশাল হচ্ছে সেই অদ্ভুত প্রাণী যাদের ভারতের উন্নতি দেখলেই গাত্রদাহ হয় এবং যেখানে ভারতের উন্নতি সেখানেই বাধা দেওয়ার জন্য এরা হাজির হয়।

দেশের যেখানেই কোথাও উন্নয়নমূলক কাজ হয় সেখানেই বাধা দেওয়ার জন্য পৌঁছে যায় এই তথাকথিত দিমাগি নকশাল বা আরবান নকশাল বাহিনী। কোথাও এদের পরিচয় হয় পরিবেশ কর্মী, কোথাও এদের পরিচয় হয় মানবাধিকার কর্মী। আর অদ্ভুত এদের এই পরিবেশ আর মানবাধিকারের সংজ্ঞা। দেশের কত জায়গায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে সেখানে এদের পাওয়া যায় না খুঁজে, দেশের কত জায়গায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে উগ্রপন্থীদের দ্বারা সেখানেও এদের পাওয়া যায় না খুঁজে। তাহলে কোথায় এদের খুঁজে পাওয়া যায় একটু ভেবে দেখা যাক।

মূলত কৃষিপ্রধান ভারত খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। ভারতের প্রায় ৮০টি এমন জেলা আছে যে জেলাগুলি বিভিন্ন খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। জেলাগুলি মূলত মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও বিহারের কিছু অংশে অবস্থিত। এই খনিজ পদার্থের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হলে ভারত শিল্পে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হতো। কিন্তু ভারত শিল্পে স্বয়ম্ভর হলে চীনের বাজার নষ্ট হবে, চীন তার উৎপাদিত পণ্য ভারতে রপ্তানি করতে পারবে না, তাই চীন ভারতের শিল্পক্ষেত্রের এই বিপুল সম্ভাবনাকে নষ্ট করার জন্য এই জেলাগুলিতে মাওবাদী নামক উগ্রপন্থীদের অর্থ ও অস্ত্রদ্বারা সাহায্য করছে। চীনপ্রদত্ত অর্থবলে ও অস্ত্রবলে বলীয়ান মাওবাদীরা এই সমস্ত এলাকায় এমন অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছে যে এখানে ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে দেশের শাসনব্যবস্থা। ফলে ভারতের শিল্পে উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আর এই মাওবাদীদের কলমের দ্বারা ও প্রচারের দ্বারা সমর্থন করার জন্য, তাদের মিথ্যে ভাবমূর্তি তৈরির জন্য এসব জায়গাতেই এরা থাকে। সেখানে এরা থাকে তথাকথিত পরিবেশ রক্ষার নামে ভারতের উন্নতিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যাতে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর চীন লাভবান হয়।

> **মাওবাদীদের টার্গেট বরাবরই ভারতের প্রান্তিক দরিদ্র মানুষ। এদের ওপরই অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে মাওবাদীরা তাদের সুখের রাজপ্রাসাদ গড়ে তোলে। সেই মাওবাদীদেরই সমর্থন করে এই তথাকথিত দিমাগি নকশাল বা আরবান নকশালরা।**

বর্তমান দুনিয়ায় মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি তৈরির চিপস হলো মহামূল্যবান জিনিস আর এই চিপস তৈরিতে রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট হলো গুরুত্বপূর্ণ। এই রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট এখন চীন ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য দেশগুলির হাতেই বেশি আছে। সেজন্য ভারত এই ক্ষেত্রগুলিতে পিছিয়ে পড়ছে কিন্তু এই রেয়ার আর্থ বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে লাদাখে আর তাই লাদাখে এই রেয়ার আর্থের খনন কাজ চালাতে ভারতকে বাধা দেওয়ার জন্যই চীন লেলিয়ে দিয়েছে তাদের পোষ্য ওয়াংচুককে, যাতে সেখানে রেয়ার আর্থ ভারত তুলতে না পারে এবং চীন ভারতীয় অর্থনীতিকে চিরকাল শোষণ করতে পারে। তাই পরিবেশ রক্ষার নামে সেখানে তথাকথিত আন্দোলন শুরু করেছে সেই ওয়াংচুক।

প্রসঙ্গত, লাদাখকে দখল করার জন্য চীনের প্রচেষ্টা আজই প্রথম নয়। চীন লাদাখের সীমানাকে লঙ্ঘন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভারতের ওপর ১৯৬২ সালে। তৎকালীন নিষ্ক্রিয় ভারত সরকার ব্যর্থ হয়েছিল সেই আক্রমণকে ঠেকাতে। চীন দখল করেছিল ভারতের ৬২ হাজার বর্গ কিলোমিটার পরিমাণ ভূখণ্ড। হিমালয়ের বরফাবৃত প্রান্তরে অবস্থিত সেই বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ডের গুরুত্ব অনুধাবন করতে ভুল করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী।

ফঃ ২

ঊষর সেই প্রান্তর সম্পর্কে বলেছিলেন 'Not a blade of grass grows There' (সেখানে তো একটা ঘাসও জন্মায় না, অর্থাৎ কৃষিকাজ হয় না)। কিন্তু সে ঊষর প্রান্তরের গুরুত্ব ছিল অন্য জায়গায়। সে গুরুত্ব এখন অনুভূত হচ্ছে। আজ চীন লাদাখের বাকি অংশকেও দখল করতে চায় এই দিমাগি নকশাল ওয়াংচুককে সঙ্গী করে।

আগ্রাসী চীনের ব্যাদিত মুখগহ্বর শুধুমাত্র লাদাখ সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকছে না, উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন সীমানায়ও তারা আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। উত্তরবঙ্গকে বিপন্ন করার পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগের একমাত্র পথটিকেও (দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং নিয়ে গঠিত 'চিকেন নেক' আনতে চাইছে নিজের অধিকারে, যাতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ বিনষ্ট হবার ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সোনার খনিসদৃশ অরুণাচল প্রদেশ চলে আসে তাদের অধিকারে। উত্তর-পূর্ব ভারতে চীনা আগ্রাসন প্রসঙ্গে বলা যায়, অরুণাচল প্রদেশ-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের উদ্দেশ্যে দিমাগি নকশালদের মানসগুরু উন্নাসিক নেহরু বলেছিলেন— 'অসম ও সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতবাসী— আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাদের আমি ভারতে আর রাখতে পারলাম না!' এখানকার ভূপ্রকৃতি পাহাড়ি ঢালবিশিষ্ট হওয়ায় কৃষিতে এই অঞ্চল খুব পিছিয়ে। কৃষিতে উত্তর-পূর্ব ভারত খুবই পিছিয়ে, কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্ব অন্য জায়গায়, হিমালয়ের ঠিক প্রান্তদেশে অবস্থিত এই অঞ্চলটি হিমালয়ের বরফ গলা জলে সমৃদ্ধ থাকে সারা বছর। পাহাড়ি ঢাল বরাবর সেই জল প্রচণ্ড গতিতে নিম্নমুখী হয়। ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অরুণাচল প্রদেশ-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত সোনার খনিসদৃশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশেই বছরে এক লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত মিলিয়ে পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। আজ ক্রমক্ষয়িষ্ণু তেলের ভাণ্ডারের ওপর এবং ক্রমক্ষয়িষ্ণু খনিজ কয়লাজাত তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল গোটা বিশ্বের শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্র যখন শক্তির সন্ধানরত, তখন এই বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ ভারতীয় অর্থনীতির এক চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হতে পারে। কিন্তু দিমাগি নকশালদের পরিবেশ রক্ষার মিথ্যে প্রচারের কারণে সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

ভারতের শিল্পোন্নয়নের সমস্ত সম্ভাবনাকে চীন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চায়, তার লক্ষ্য সে ভারতকে তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার ও কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ হিসেবে রেখে দিতে চায়, ঠিক ঔপনিবেশিক আমলের ব্রিটিশের মতো। বস্তুত পলাশীর যুদ্ধের আগের মানদণ্ডধারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকের সঙ্গে আজকের চীনের কার্যপদ্ধতির অদ্ভুত সাদৃশ্য। আর এই কাজে চীনকে সাহায্য করছে ভারতের অভ্যন্তরে চীনের পঞ্চম বাহিনী হিসেবে থাকা এই দিমাগি নকশালরা।

এদের এই কাজগুলি করার ক্ষেত্রে এরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে মিথ্যে বিমর্শ বা মিথ্যে ধারণা বা মিথ্যে ন্যারেটিভ। এই মিথ্যে ন্যারেটিভ তৈরির কাজে তারা ব্যবহার করছে কিছু বিপথগামী ছাত্র, অধ্যাপক ও সাংবাদিককে। ভারত বিরোধী মিথ্যে ন্যারেটিভ তৈরি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ককে দুর্বল করে বিপথগামী করে। এরা সমর্থন করে এদেরই দোসর সেই অস্ত্র হাতে চলা মাওবাদী উগ্রপন্থীদের। যে মাওবাদী উগ্রপন্থীরা ভারতের এই প্রান্তিকতম অঞ্চলগুলিতে থাকা দরিদ্র মানুষদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় সেই মাওবাদীদেরই এরা সমর্থন করে। তখন এই তথাকথিত মানবাধিকার কর্মীদের এটা মাথায় আসে না যে এই দরিদ্র মানুষদেরও মানবাধিকার রয়েছে। যাদের মানবাধিকার মাওবাদীরা পদদলিত করছে নিত্যদিন। ভারতের যে আশিটি জেলার কথা বলা হয়েছে সেই জেলাগুলিতে কিন্তু দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও প্রচুর এবং সেই মানুষগুলির উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে এই মাওবাদীরা।

মাওবাদীদের টার্গেট কখনোই কিন্তু কোনো বিদেশি শক্তি হয় না; বরাবরই হয় ভারতেরই প্রান্তিক দরিদ্র মানুষেরা। এদের ওপরই অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে মাওবাদীরা তাদের সুখের রাজপ্রাসাদ গড়ে তোলে। সেই মাওবাদীদেরই সমর্থন করে এই তথাকথিত দিমাগি নকশাল বা আরবান নকশালরা। প্রকৃতপক্ষে এদের দিমাগি নকশাল বলাই ভুল, দিমাগি কথাটার অর্থ হলো মস্তিষ্ক, এদের তো মস্তিষ্ক বলে কিছু নেই। এরা হয় বিকৃত মস্তিষ্ক বা বিক্রীত মস্তিষ্ক।

এরা বিকৃত মস্তিষ্ক, কারণ নিজের দেশের উন্নতি এদের সহ্য হয় না। এরা বিক্রীত মস্তিষ্ক, কারণ এদের মাথা এরা বিক্রি করে দিয়েছে চীন ও অন্যান্য বিদেশি শক্তির হাতে। বিদেশ থেকে এদের কাছে প্রচুর টাকা আসে বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে এবং সেই টাকাই তারা ব্যবহার করে ভারত বিরোধী প্রচারের জন্য। প্রকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী যারা তারা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়; আর যারা বিকৃত বা বিক্রীত মস্তিষ্কের অধিকারী, তারা ধ্বংসাত্মক কাজের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়।

দেহের মধ্যে কোনো কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ও অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে বলা হয় ক্যানসার। এই ক্যানসার ভেতর থেকেই দেহকে শেষ করে দেয়, বাইরের আঘাতের আর প্রয়োজন পড়ে না। এরকম এই দিমাগি নকশালরা হলো জাতির জীবনের ক্যানসার। এরা দেশের ভেতরে থেকেই গোটা দেশকে শেষ করে দেবার ষড়যন্ত্রে মেতেছে। সরকার এদের দমনের জন্য অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু সেই চেষ্টাকে সফল করার জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকতে হবে। এই দিমাগি নকশালরা ধ্বংস হলেই ভারত প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। □

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও হত্যা অব্যাহত

সন্তু গায়েন

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও হত্যা নতুন কিছু নয়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া রংপুরের জেলা স্কুলের শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী-সহ তাঁর পুরো পরিবারের চারজন সদস্যকে নির্মম ও রহস্যজনকভাবে হত্যা আন্তর্জাতিক স্তরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর সংগঠিত আক্রমণকে পরিকল্পিত নিপীড়ন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যাকে বাংলাদেশ সরকার তদন্তের মুখ ঘুরিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। ১৯৪১ সালে জনগণনা অনুসারে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ২৮ শতাংশ। ১৯৫১ সালের দেশভাগের পর বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা কমে ২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও আগস্ট ১৯৪৯ থেকে জানুয়ারি ১৯৫০ পর্যন্ত চলা পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন পাকিস্তানি পুলিশ, প্যারা মিলিটারির সাহায্যে হিন্দুদের উপর হত্যা, লুটপাট অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, ধর্ষণ ও নির্যাতন চালায়। ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসের সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার, বরিশাল ও ভাডারিয়া গ্রামের স্থানীয় মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর লুটপাট, হত্যা ও ধর্ষণ সংগঠিত করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার বেশিরভাগ অধিবাসী ছিল হিন্দু যাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ভুঁইয়া কৈপত্র সম্প্রদায়ের মানুষজন ছিল বেশি।

১৯৪৯ সালের শরৎকালে রাজশাহী জেলায় হিন্দুদের শুরু করা তেভাগা আন্দোলন ব্যর্থ করতে পাকিস্তানি পুলিশ নির্বিচারে হত্যা ও নৃশংসতার পথ বেছে নেয়। বেসরকারি হিসেবে ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু গণহত্যার সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশি। তখন লক্ষাধিক মানুষ ভারতে পালিয়ে আসে। ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হযরত বাল মসজিদ থেকে পবিত্র চুল চুরির গুজবকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের খুলনা ও ঢাকাতে হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর বর্বরোচিত হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ চালানো হয়। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় হিন্দুদের মালিকাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা ও বাড়িঘরে আগুন লাগানো হয় এবং সুনির্দিষ্ট আক্রমণ চালানো হয়। খুলনা, দৌলতগঞ্জ, মংলা, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের আদমজীতে ভয়ানক হিন্দুহত্যা শুরু হয়। ঢাকার সংবাদপত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর রিপোর্ট অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির ৯৫ শতাংশ ছিল হিন্দুদের। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক আমির হোসেন চৌধুরী হিন্দুদের উপর আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে মারা যান এবং আমেরিকার জাতীয় অধ্যাপক ও নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার নোভাক একটি হিন্দু পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারান।। হযরত বাল কাণ্ডের পরে ঢাকাতে শিক্ষক ও ছাত্রশূন্য স্কুলগুলিতে হিন্দুদের জন্য আশ্রয় শিবির খুলতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তানের আইয়ুব খান সরকার।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা কমে ১৩.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের ২১ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট অপারেশনের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আল বদর, আল-শামসের বাহিনী নয় মাসে ৩০ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করে এবং এক কোটি হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলিতে রোগাক্রান্ত হয়ে এবং দেশ ত্যাগের শোকে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। হিন্দু গ্রাম ঘিরে ফেলে পুরুষদের হত্যা, নারীদের ধর্ষণ, মন্দির ভাঙচুর, প্রতিমা ভাঙা এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তর ও অপহরণের ভয় দেখিয়ে বাড়িঘর জমি জমা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল চুকনগর ও জাথিভাঙ্গায় হিন্দুহত্যার মাধ্যমে।

২০২২ সালের জনসংখ্যাগত পর্যালোচনা অনুসারে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭.৯৫ শতাংশ যা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় আসার পথ থেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের জীবন-জীবিকা ও সম্মান পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে, তবে বিগত কয়েক বছরের তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারকাতের গবেষণা অনুসারে ১৯৬৪ থেকে ২০১৩-এর সময়ে প্রায় ১.১৩ কোটি হিন্দু দেশ ত্যাগ করে ভারতে এসেছেন যা দিনে গড়ে ৬৩২ জনের সমান। কারণ হিসেবে তিনি ধর্মীয় নিপীড়ন, ভূমি দখল এবং নিরাপত্তাহীনতাকে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের আইন ও সালিসি কেন্দ্রের হিসেব অনুসারে জানুয়ারি ২০১৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১-এর মধ্যবর্তী সময়ে ৩৬৭৯টি হিন্দুদের উপর হামলা রেকর্ড করা হয়েছে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মতে ২০২৫ সালের জানুয়ারির থেকে জুনে ২৯৮ নথিভুক্ত ঘটনা যার মধ্যে ৫৯টি ধর্মীয় স্থানে হামলা ও কুড়িটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। হিন্দু মহাজোট দাবি করেছে বিগত বছরে ১৪৯ জন হিন্দুকে হত্যা, ৩৭টি নারী ধর্ষণ ও ২৬২৩ জনকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। ২০২১ সালে কুমিল্লায় একটি দুর্গাপূজার মন্দিরে কোরান রাখার গুজবে দেশব্যাপী দুর্গাপূজার সময় মণ্ডপে মণ্ডপে হামলা ও দুর্গা প্রতিমার মাথা কেটে নেওয়ার ঘটনা ঘটে।

গত ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনাকে বিতাড়নের পর দেশ জুড়ে হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আওয়ামি লিগের সমর্থক ছিল। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক প্রথম আলো পরিসংখ্যান অনুসারে পাঁচ আগস্ট থেকে বিশ আগস্ট দু' হাজার কুড়ির মধ্যে ১০৬৮টি হামলার ঘটনা ঘটে এবং ৬৯টি মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০২৫ সালে সীতাকুণ্ড কালীমন্দিরে আগুন, গাইবান্ধা, কুষ্টিয়া, নেত্রকোনায় প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ২০২৪-২৫ সালের ঘটনাকে ভারতের একটি প্রথম শ্রেণীর বৈদ্যুতিন সংবাদ সংস্থা মতামত কলমে 'অনগোয়িং জেনোসাইড' হিসেবে ধরা হয়েছে।

UNOHCHR রিপোর্ট অনুসারে ২০২৪ আগস্টের আক্রমণের পিছনে ধর্মীয় বৈষম্য, রাজনৈতিক প্রতিরোধ, জমি বিবাদ এই সবই ছিল সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর সংখ্যাগুরু মুসলমানদের অত্যাচার। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০২৪ পরবর্তী সংখ্যালঘুদের উপর ঘটে যাওয়া আক্রমণ ও হত্যার বিরুদ্ধে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলে, 'হিন্দু, আহমদিয়া ও অন্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অপরাধ ও ভায়োলেন্সের দ্রুত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি হবে'। বারবার সংখ্যালঘুদের উপর ঘটে যাওয়া ভায়োলেন্স এবং সরকারের দেওয়া ভুল তথ্য ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার দিতে সরকারের ব্যর্থতা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে।

২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পোশাক-শ্রমিক দীপুচন্দ্র দাসের ব্লাসফেমির অভিযোগে গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলে 'অন্তর্বর্তী সরকারকে অবিলম্বে সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ীদের মৃত্যুদণ্ড ছাড়া ন্যায্য বিচারে জবাবদিহি করতে হবে'। ২০২৫ সালে জুলাই মাসে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমালোচনা করে Human Rights Watch বলে, 'অন্তর্বর্তী সরকার মানবাধিকার প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। মব ভায়োলেন্সের উল্লেখযোগ্য উত্থান ঘটেছে।' ১৯৬৫ সালের Enemy properly Act বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর Vested property Act নামে চলতে থাকে যার সবচেয়ে কুপ্রভাব পড়েছিল সংখ্যালঘুদের উপর। অধ্যাপক আবুল বারকাতের গবেষণা অনুযায়ী '১৯৬৫ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ২৬ লক্ষ একর জমি হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা কেড়ে নেয় এবং ১.২ কোটি হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

বাংলাদেশে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর নির্বাচনের বিএনপি ক্ষমতা দখলের পর হিন্দুদের উপরে অত্যাচার বেড়েছে। ২০২৬ ভোটের আগে বিএনপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে আইনগত ভাবে রক্ষাকবচ দেওয়া হবে কিন্তু তারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। মানবাধিকার গোষ্ঠী ও সংবাদমাধ্যমে উঠে আসা অভিযোগগুলো অনুসারে চুয়াডাঙ্গায় হিন্দু নারীকে গাছে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ, সিলেটের গাইঘাটে হিন্দু শিক্ষকের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ব্যবসায়ীকে মারধর ও গায়ে পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামি লিগ অভিযোগ করেছে বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম তার সশস্ত্র গুন্ডা নিয়ে হিন্দু বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে ও মসজিদ ভাঙচুর করছে। ভারতের তথা হিন্দু ধর্মালম্বীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এত তীব্র হয়েছে যে গত ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও শিলিগুড়ির করিডোর লাগোয়া জেলাগুলি যেমন সাতক্ষীরা কুষ্টিয়া খুলনা, রংপুর ও ঝিনাইদহের মতো জায়গাতে জেহাদি, মুসলমান দল জামাত জিতেছে। কারণ আওয়ামি লিগ নেতাদের জামিন মুক্ত করতে জামাত নেতারা তৎপর ছিল, তাই আওয়ামি লিগের নেতারা জামাতকে ভোট জেতাতে চেয়েছিল। এই এলাকাগুলিতে শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্ন এবং দারিদ্র্য অত্যন্ত বেশি, তার সুযোগ নিয়ে উগ্র ভারত বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে জামাতের মতো সংগঠন ভোট পেয়েছে। বাংলাদেশি মাইনরিটিস অ্যালায়েন্স বা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের হিন্দু গ্রুপগুলোর মহাজোট ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জেনিভাতে ১৭তম UN forum on minority issues-এর অংশ নিয়ে টার্গেটেড হত্যালীলা বন্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ চেয়েছে। নতুন দিল্লি ভিত্তিক Rights and risk analysis group জাতিসঙ্ঘের স্পেশাল রেপরটিয়ারস্‌কে বাংলাদেশে হিন্দু কর্মকর্তাদের racial profiling বন্ধে হস্তক্ষেপ করতে বলেছে। জাতিসঙ্ঘের বর্ণবাদ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘু বিষয়ক রেকডিয়ার্ড এ ধরনের অভিযোগে তদন্ত করতে বলেছে বাংলাদেশ সরকারকে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে—

(ক) হিন্দু মহল্লায় গ্রামের যুবকদের রাত পাহারায় কাজে নিযুক্ত হতে বলেছে।

(খ) হামলার ভিডিয়ো ছবি ও ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের কপি সংরক্ষণ করে জাতিসঙ্ঘ ও এনএইচআরসি-তে পাঠাতে বলেছে।

(গ) হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ মিলে গ্রামভিত্তিক সম্প্রীতি রাখা, যাতে গুজব ছড়ালে তথ্য যাচাই করতে পারে।

(ঘ) হুমকির কারণে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হলে জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো।

বাংলাদেশের বিএনপি সরকারের উচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে সার্কুলার দিয়ে কোনো হিন্দু ভিকটিম থানায় গেলে এফআইআর নিতে এবং কোনো গড়িমসি করা যাবে না। নিহতের পরিবারকে কম করে দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও ঘর পুড়লে পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া। বিএনপি, জামাত ও আওয়ামি লিগ যৌথ বিবৃতি দিয়ে সংখ্যালঘু হামলা করলে দল থেকে বহিষ্কার করা সিদ্ধান্ত নেওয়া। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু পুলিশি মোতায়েন নয়, বিচারহীনতার পরিবেশ দূর করা দরকার। বাংলাদেশ সরকারের উচিত সংখ্যালঘু নিপীড়নের বিষয়ে জিরো টলারেন্স গ্রহণ করা। তবে আদৌ পরামর্শগুলি কতটা কার্যকর হবে তা নির্ভর করবে আগামী দিনের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির ও সার্বিক ভালো থাকার উপর।

□

শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার কেন একইভাবে গণ্ডগোল হচ্ছে?

সুদীপ্ত গুহ

১৯৮০-'৯০-এর দশকে উচ্চ মাধ্যমিকের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান মেধার ছেলে-মেয়েরা শিবপুর বি.ই. কলেজ, দুর্গাপুর আর.ই. কলেজ ও জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তো। এখন দুর্গাপুর আর.ই. কলেজ 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, দুর্গাপুর'-এ পরিণত হওয়ায় অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় কিছুটা এগিয়েই রয়েছে। JEE MAINS থেকে একটু ওপরের দিকে র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র-ছাত্রী পায় তারা। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ বা আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে যারা পড়াশোনা করে তারাও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সমান যোগ্যতার অধিকারী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ও আর্টসের ছেলেমেয়েদের সমান মেধার ছেলেমেয়েরা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও স্কটিশ চার্চ কলেজে যায়। খড়্গপুর আইআইটি, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই, কলকাতা) ও আইআইএম, কলকাতা-র ছাত্র-ছাত্রীরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে যে অনেক এগিয়ে তা বলাই বাহুল্য। তাহলে এতগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ধাঁচে এরকম নৈরাজ্যবাদী, রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন করে না? কয়েকবছর আগে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা মাত্র একদিনের আন্দোলনে তৎকালীন রাজ্য সরকারকে শুইয়ে দেয় এবং পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পর্যন্ত তাঁদের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হয়। আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারবাবুরা কিন্তু কোনোরকম অসভ্যতা করেননি, দেশবিরোধী স্লোগান দেননি। পুরো সমাজের সমর্থন পান তাঁরা। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ডাঃ অভয়ার হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন তো বিশ্বব্যাপী ইতিহাস তৈরি করে। কোনো কুরুচিকর সংস্কৃতি বা অসভ্যতার নিদর্শন না রেখে সারা পৃথিবীর সমর্থন লাভ করে ঐতিহাসিক সেই আন্দোলন। তাহলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন কেন বারবার বিতর্ক তৈরি করে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, ১৯৯০-এর দশকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের নামে যে অসভ্যতা এসএফআই ও অতিবামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি করত, ২০১৪-র পরও একইভাবে সেটা তারা করে চলেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমে যোগ দিতে গিয়ে কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, জগদীপ ধনখড়, বাবুল সুপ্রিয়, অগ্নিমিত্রা পাল বা ব্রাত্য বসু বিভিন্ন বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্র সংগঠনের অসভ্যতার সম্মুখীন হয়েছেন। গত ১৯ আগস্ট থেকে ছাত্র আন্দোলনের নামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা শুরু হয়েছে— আগের ও এখন, সবক্ষেত্রেই তার চরিত্র কিন্তু এক। অথচ ১৯৯০-এর দশকের ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র এবং বর্তমান প্রজন্মের 'জেন-জি' ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র অনেকটাই অন্যরকম। তাহলে এই 'আন্দোলন' একই রকম কীভাবে হয়? দু'টো প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একটাই।

জুটা (যাদবপুর ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনের কিছু নেতা এই পুতুলখেলার আসল সঞ্চালক। '৯০-এর দশকের অরাজক ছাত্র আন্দোলন হোক, ২০১৪-র 'হোক কলরব' আন্দোলন হোক বা গত ১৯ আগস্ট রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর আক্রমণ হোক— এই শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব একইভাবে বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীদের কুশিক্ষার কোচিং দিচ্ছেন। ১৯৯৪ সালের ১১ মে রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক বাম ছাত্র নেতা অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভয়াবহভাবে নিগ্রহের পরিকল্পনা করে। সেই উদ্দেশ্যে দলবল জড়ো করে যখন আক্রমণের প্রস্তুতি তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে, সেই সময় তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। গেটের সামনে প্রচুর লোকজন জড়ো হয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে দেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েন। উনি ওখানে ঢুকে পড়ায় বামপন্থী হার্মাদরা সেই মুহূর্তে ওখান থেকে পালিয়ে যায়। সেদিনের বামপন্থী ছাত্র নেতা পরবর্তী পর্যায়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। যাঁরা সেদিন বামপন্থীদের টার্গেট ছিলেন, তাঁরা পরবর্তী পর্যায়ে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্পোরেট লিডার হয়েছেন। সেদিন রাতে যদি এরাজ্যের তৎকালীন বিরোধী নেত্রী হঠাৎ ওই রাস্তা দিয়ে না যেতেন, তাহলে আজকের অনেক আইআইটি বা বিদেশের বিভিন্ন ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা কর্পোরেট লিডার হয়তো ইহলোকে থাকতেন না। সেই বামপন্থী অধ্যাপক আজ 'ডিন'। ২০১৬-তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'বুদ্ধ ইন এ ট্রাফিক জ্যাম' সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়। এই বামপন্থী

> ১৯৭০ সালে এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনকে হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নেয় বামপন্থীরা। ঋষি অরবিন্দর 'জাতীয়তাবাদী শিক্ষা'র স্বপ্নকে সফল করতে এই বামপন্থীদের চিহ্নিত করে শাস্তিদান প্রয়োজন।

অধ্যাপকদের একজন— সেই সিনেমা প্রদর্শনের সঙ্গে যুক্ত জাতীয়তাবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের কিডন্যাপ করতে বাম ও অতিবাম ছাত্রদের উৎসাহ দেন এবং ক্যাম্পাসের ভিতর থেকে রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। সম্প্রতি ক্যাম্পাসে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে চরম সুযোগসন্ধানী সেই অধ্যাপক বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ও অধ্যাপক সংগঠনের সদস্যপদ পাওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। ফলে এই ধরনের মারাত্মক এলিমেন্টদের থেকে সকলের সাবধান থাকা অতি আবশ্যক।

ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা নয়। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সমস্যার মূলে রয়েছে জুটা এবং একমাত্র জুটা।

কিন্তু কেন 'জুটা'? কারণ কি শুধুই রাজনীতি? নাকি আরও বেশি?

কলকাতার প্রচুর বহুতল বিল্ডিঙের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকগুলি পরীক্ষা করেন পরিবেশ বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক— 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'- এর নাম ভাঙিয়ে, যা তিনি করতে পারেন না। একজন অধ্যাপক বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় ঘুষ দিয়ে বিভিন্ন বড়ো স্ট্রাকচার চেক করেন। পোস্তা ব্রিজের কনস্ট্রাকশন তিনি সার্টিফাই করেছিলেন। পোস্তা ব্রিজ ভেঙে পড়ার পরও ধরা না পড়ে এত বছর ধরে দিব্যি ঘুরে বেরিয়েছেন। চোখ বুজে কোনো প্রোমোটার বা ডেভেলপার— মাটি পরীক্ষা, বিল্ডিং মেটিরিয়াল পরীক্ষা, কংক্রিট পরীক্ষা যদি করাতে চান তবে একমাত্র রাস্তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই টেস্টিং ল্যাবরেটরি। কিন্তু এই চক্রকে ধরার কেউ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই চক্র ভাঙতে গেলেই ছাত্র-ছাত্রীদের লেলিয়ে দেওয়া হবে। যেমন ছিল 'হোক কলরব' বা গত ১৯ আগস্ট রাতের আন্দোলন। এছাড়াও রয়েছে সন্দেশখালির মতো পিঠে বানানোর 'রান্নাঘর'। এখানে পিএইচডি ছাত্রী, এমনকী ছাত্রদের দিয়েও 'পিঠে' বানানো বহুদিনের রেওয়াজ! শেখ শাজাহানকে যতটা ভয় পেতেন সন্দেশখালির মহিলারা, এই অধ্যাপকদের তার থেকে বেশি ভয় পায় ছাত্রীরা। কিন্তু বাজারি সংবাদমাধ্যম ম্যানেজ হলে কোনো খবর বাইরে আসবে না। বামপন্থী অধ্যাপকদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে এরাজ্যে বহু চুনী কোটাল আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন, যার খবর করেনি আরবান নকশাল প্রভাবিত বাজারি সংবাদমাধ্যম। গত ১৯ আগস্ট রাতে বাম ও অতিবামপন্থীদের প্রবলভাবে নিগৃহীত হওয়ার পর জাতীয়তাবাদী ছাত্র-ছাত্রীরা পালটা প্রতিরোধ গড়ে তুললে বিভিন্ন বাজারি সংবাদমাধ্যমে ন্যারেটিভ উঠে আসে— 'যাদবপুরে গেরুয়া সন্ত্রাস', 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেরুয়া গুন্ডামি'। ১৯ আগস্টের পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্র সংগঠনের মিছিলকে তারা 'নাগরিক মিছিল' হিসেবে অভিহিত করে। গত ২৮ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতি বিজড়িত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪নং প্রবেশদ্বার ও সুলেখা ক্রসিঙের মাঝে রাজা সুবোধ মল্লিক রোডে 'রাখিবন্ধন'-এর কার্যক্রম এবং ১০ হাজার কণ্ঠে পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' গানের বিরোধিতা করে সম্পাদকীয় পর্যন্ত প্রকাশ করে একটি বাজারি পত্রিকা। ওই স্থান রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্'-এর উপযুক্ত নয় বলে তারা মতপ্রকাশ করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করে সামাজিক সংহতি স্থাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত এই কার্যক্রমে কেন তাদের এত গাত্রদাহ তা সকলেরই বোধগম্য।

বিভিন্ন সময় নানা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মদ-গাঁজা-সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের ঠেক এবং নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বিকৃতকাম বাম ও অতিবামপন্থীদের র‍্যাগিঙের খবর। গত ১৯ আগস্টের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন ফ্লেক্স, ব্যানার হাতে নিয়ে মিটিং-মিছিল করছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে। সেখানে জাতীয়তাবাদীদের 'ফ্যাসিস্ট' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্যাসিস্টদের আঘাত নেমে এলে পালটা আঘাত ফিরিয়ে দেওয়ার কথা এইসব ব্যানার ও পোস্টারে লেখা হয়েছে। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে, এই ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু নির্দোষ। তারা এত বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গড়ে ওঠা বাম ও অতিবাম ইকোসিস্টেমের হাতের পুতুল। এই পুতুলদের নিয়ন্ত্রণের সুতো 'জুটা'র হাতে। 'জুটা'র এই অধ্যাপকদের যদি আইআইটি-বোম্বে, বা এমআইটি (মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি)-তে পাঠানো হয়, তবে ওখানেও একইভাবে আগুন ধরবে। একথা এই প্রতিবেদক দায়িত্ব সহকারে বলছে। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ আজ থেকে দু'বছর আগে গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে পড়তে আসা স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর হত্যাকাণ্ডের আসামি আজও সেই মামলা থেকে মুক্ত হতে না পারার পরও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই পিএইচডি-র অ্যাডমিশন পায়। যারা তাকে অ্যাডমিশন দেয়, তারা একসময়ের সিপিএমের বিধানসভা প্রার্থী এবং যিনি ওই হত্যাকারীর পিএইচডি গাইড— তিনিও একদা বিধানসভা ভোটে সিপিএমের প্রার্থী ছিলেন।

'জুটা' ছাড়াও আরেকটি সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সক্রিয়। সংগঠনটি হলো— Chashm-e-Awaam। উর্দু থেকে আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করলে 'চশম-এ-আওয়াম'-এর অর্থ দাঁড়ায় 'পাবলিক আই' বা সাধারণ মানুষের চোখ। এটি বাম ও অতিবাম ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত একটি তথাকথিত সাংস্কৃতিক ফোরাম। বাম ও অতিবাম চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিল্প প্রদর্শনী ও ছাত্র আন্দোলন তারা করে থাকে। তথাকথিত প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতি, পথনাটিকা ও মুক্তমঞ্চের নাট্য সংস্কৃতির মধ্যে এরা ব্যাপকভাবে সক্রিয়। এর সদস্য ও সংগঠকরা অতিবামপন্থী ছাত্র সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'- সহ অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিতেও সক্রিয়। তথাকথিত 'স্বাধীন শিল্পকলা' ও সঙ্গীতকে সাংগঠনিক কার্যকলাপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে তারা কাজ করে থাকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সক্রিয় বাম ও অতিবামপন্থীদের এই দলটি তথাকথিত স্বাধীন লেখক, চারুশিল্পী ও সঙ্গীতশিল্পীদের একত্রিত করে বিভিন্ন 'কালচারাল ফেস্টিভাল'-এর আয়োজন করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিল্ডিঙের দেওয়ালে 'ফ্রি প্যালেস্তাইন', 'ফ্রি কাশ্মীর'-এর মতো কথাবার্তা লিখে, আজেবাজে ছবি এঁকে বাম-জেহাদি চিন্তাধারা প্রচার, তথাকথিত সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা-সহ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী ও দুর্দশাগ্রস্ত শিল্পীদের নানারকম সহায়তা দানের অন্তরালে অব্যাহত থাকে এই রাষ্ট্রবিরোধীদের বিভিন্ন কার্যকলাপ।

অনুশীলন সমিতি-যুগান্তর যুগে ন্যাশনাল স্কুল ও ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেনি শ্রীঅরবিন্দ-সহ দেশবরেণ্য মনীষী, শিক্ষাবিদ ও বিপ্লবীরা। ১৯৫৬-তে সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিণত হয় 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'-এ। ১৯৭০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনকে হত্যা করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নেয় বামপন্থীরা। ঋষি অরবিন্দের 'জাতীয়তাবাদী শিক্ষা'র স্বপ্নকে সফল করার লক্ষ্যে এই বামপন্থীদের সবাইকে চিহ্নিত করে কড়া শাস্তিদান প্রয়োজন।

আজাদির বিকৃতি : বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উগ্রবাম আধিপত্য, বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রবিরোধী ন্যারেটিভের উত্থান

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একসময় ছিল প্রশ্ন, যুক্তি ও মুক্ত চিন্তার কেন্দ্র। সেখানে সরকারকে প্রশ্ন করা হতো, কিন্তু দেশ ভাঙার ভাষা ছিল না। আজ সেই সীমারেখা ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ), কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কিছু চিকিৎসা ও পেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতা দীর্ঘদিন ধরে শিকড় গেড়েছে— যাকে শুধুই 'বামপন্থা' বলা ভুল হবে। এটি হলো উগ্রবাম বা অতিবাম মতাদর্শ, যার মূল বৈশিষ্ট্য দেশের প্রতি মৌলিক বৈরিতা।

এই রাজনীতি যুক্তির নমে স্লোগানকে, গবেষণার নামে মতাদর্শকে, আর মুক্তচিন্তার নামে একচেটিয়া বুদ্ধিবৃত্তিক দখলদারিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা আছে— কিন্তু শুধুমাত্র সেই প্রশ্ন করার, যা তাদের মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর বাইরে গেলেই তকমা জোটে— 'ফ্যাসিস্ট', 'দেশের দালাল', 'সংখ্যালঘু- বিরোধী'।

সবচেয়ে বিপজ্জনক শব্দটি, যা এই রাজনীতির কেন্দ্রে ঘোরে, তা হলো 'আজাদি'। এই শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রাখা হয়। আজাদি কীসের থেকে? দারিদ্র্য থেকে? বৈষম্য থেকে? না কি ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা থেকেই? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেওয়া হয় না। কারণ অস্পষ্টতাই এই রাজনীতির শক্তি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একে বলা হয় Strategic Ambiguity— যেখানে শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু অর্থ এড়িয়ে যাওয়া হয়।

জেএনইউ-তে 'আজাদি' স্লোগানের সঙ্গে কাশ্মীর প্রসঙ্গ জুড়ে যাওয়া, ভারতের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা পাকিস্তানি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার— এসবকে বারবার 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলা হয়েছে। কিন্তু যখন একই ধাঁচের ভাষা, পোস্টার, সেমিনার ও স্লোগান বছরের পর বছর ঘুরে ফিরে আসে, তখন প্রশ্ন ওঠে— এটা কি কাকতালীয়, না কি মতাদর্শগত ধারাবাহিকতা?

যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সির মতো প্রতিষ্ঠানে দেখা গেছে— ক্যাম্পাস রাজনীতির ভাষা ক্রমশ সাধারণ শিক্ষার্থীদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেখানে ছাত্রস্বার্থের বদলে আন্তর্জাতিক বাম তত্ত্ব, তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবী রোমান্টিসিজম আর ভারতকে 'ঔপনিবেশিক কাঠামো' হিসেবে চিত্রিত করার প্রবণতা বাড়ছে। এই ভাষা শুনতে বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু এর সামাজিক ফল মারাত্মক— এটি শিক্ষার্থীদের নাগরিক হিসেবে নয়, বরং স্থায়ী দেশবিরোধী হিসেবে গড়ে তুলতে চায়।

আরও উদ্বেগজনক হলো— এই মতাদর্শ কেবল মানববিদ্যা বিভাগে সীমাবদ্ধ নেই। কিছু চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও রাজনৈতিক সক্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে শিক্ষা ও পরিষেবার নৈতিকতা পিছিয়ে পড়ছে, বিদেশি আর মতাদর্শ প্রাধান্য পাচ্ছে। ডাক্তার তৈরি হওয়ার আগে একজন ছাত্রকে 'রাষ্ট্রবিরোধী সচেতন নাগরিক' বানানোর তাগিদ দেখা যাচ্ছে— যা পেশাগত দায়িত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত।

এখানে কেউ প্রকাশ্যে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের কথা বলে না। আধুনিক উগ্র রাজনীতি অস্ত্র হাতে আসে না— আসে ভাষার মাধ্যমে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একে বলা হয় Radicalization without Guns। প্রথমে দেশের শাসন ব্যবস্থাকে নৈতিকভাবে অবৈধ ঘোষণা করা হয়, তারপর তার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দমনযন্ত্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়। শেষ ধাপে নাগরিকের মধ্যে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে দেশের প্রতি কোনো আনুগত্যই নৈতিক নয়।

এই প্রবণতা গণতন্ত্রের জন্য দ্বিগুণ বিপজ্জনক। একদিকে এটি ভিন্নমতকে দমন করে, অন্যদিকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমালোচনাকেও দুর্বল করে দেয়। কারণ শাসন ব্যবস্থায়ই তাদের কাছে 'ফ্যাসিজম্'। এই অভিব্যক্তিই উগ্রবামের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র।

সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন— এই রাজনীতি কার

উপকার করে? সাধারণ ছাত্রের, না কি সেই আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তির, যারা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে নিজেদের কৌশলগত লাভের জন্য ব্যবহার করতে চায়? ইতিহাস বলে, বিচ্ছিন্নতাবাদ সবসময় বাইরের শক্তির হাতিয়ার হয়--- কখনো সরাসরি, কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক ন্যারেটিভের মাধ্যমে।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যদি এমন জায়গায় পরিণত করা হয়, যেখানে দেশের অখণ্ডতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই বুদ্ধিবৃত্তিক স্ট্যাটাস সিম্বল, তাহলে সেটা শিক্ষা নয়— তা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। সরকারের সমালোচনা করা আর দেশকে অস্বীকার করার মধ্যে পার্থক্য আছে। আজ সেই পার্থক্য ইচ্ছাকৃতভাবে ঘোলাটে করা হচ্ছে।

এই কারণেই বিষয়টা কোনো এক ক্যাম্পাসের নয়, কোনো এক স্লোগানের নয়। বিষয়টা হলো--- ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মানসিক কাঠামো নষ্ট করে ফেলা। তারা কি যুক্তিবাদী সমালোচক হবে, না কি দেশের স্থায়ী শত্রু দেশ? তারা কি সংস্কারের ভাষা শিখবে, না কি ভাঙার রোমান্টিকতা?

বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শত্রু নয়, আবার রাষ্ট্রবিরোধী রাজনীতির নিরাপদ আশ্রয়ও হওয়া উচিত নয়। আজ যদি উগ্রবাম মতাদর্শ প্রশ্নের নামে দেশের বৈধতাকে খণ্ডন করে, তাহলে কাল সেই শূন্যস্থান পূরণ করবে আরও চরম শক্তি। ইতিহাসের নিয়ম এটাই।

আজাদির নামে রাষ্ট্রবিরোধী ন্যারেটিভ লালন করা কোনো বিপ্লব নয়--- এটা বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্বহীনতা।

এদের ভারতবিরোধী কার্যকলাপের মুখে বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা, ভীরুতা, পক্ষপাত মতাদর্শগত দাসত্ব নয় কি? প্রশ্নটা আজ আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনার নয়। প্রশ্নটা মৌলিক— যখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভারতের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, যখন 'আজাদি' স্লোগান কাশ্মীর বা পাকিস্তানি মানসিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রাখে, যখন জাতীয় পতাকা, সংবিধান বা রাষ্ট্রীয় প্রতীককে ইচ্ছাকৃত অবমাননার ঘটনায় দেশজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়— তখন দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বড়ো অংশ চুপ থাকেন কেন? এই নীরবতা কি ইচ্ছাকৃত? নাকি এটি একটি নির্বাচিত বিরোধিতার ফল?

গণতন্ত্রে বুদ্ধিজীবীদের কাজ প্রশ্ন করা— এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু কাকে প্রশ্ন করা হয়, আর কাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। গত এক দশক আমরা বারবার দেখেছি--- সরকারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উঠলেই কলম তীক্ষ্ণ হয়, বিবৃতি আসে, সেমিনার বসে, খোলা চিঠি লেখা হয়। অথচ যখন একই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে দেশবিরোধী ভাষা, বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান বা বিদেশি শত্রু-ন্যারেটিভের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বক্তব্য উঠে আসে, তখন সেই কলম হঠাৎ শুকিয়ে যায়। এই দ্বৈত আচরণকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বলা হয় Selective Moral Outrage। অর্থাৎ নৈতিক ক্ষোভ থাকবে— কিন্তু তা হবে মতাদর্শ-নির্ভর। এর পেছনে প্রথম কারণ হলো আইডিওলজিক্যাল ক্যাপচার। ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরের একটি বড়ো অংশ বহু দশক ধরে একটি বিদেশি মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। এই পরিসরে সরকারকে সবসময়ই সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে, এখানে দেশবিরোধী শক্তিকে দেখা হয়েছে 'প্রতিরোধের প্রতীক' হিসেবে। ফলে দেশের বিরুদ্ধে কথা বলা নৈতিক সাহস, আর দেশকে ভাঙার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হয়ে ওঠে অস্বস্তিকর।

দ্বিতীয় কারণ হলো ইকোসিস্টেমের ভয়। আজকের বুদ্ধিজীবী পরিসর আর একক ব্যক্তির নয়--- এটি একটি নেটওয়ার্ক। প্রকাশনা, সেমিনার, ফেলোশিপ, আমন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি--- সবকিছুই এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। এই ব্যবস্থার বাইরে কথা বললে 'আউটকাস্ট' হওয়ার ভয় কাজ করে। ফলে অনেকেই দেখেও না দেখার ভান করেন। এটাকে বলা যায় Institutional Cowardice— প্রাতিষ্ঠানিক ভীরুতা।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুতর কারণ হলো রাষ্ট্রবিরোধিতাকে নৈতিক উচ্চতায় বসানো। কিছু বুদ্ধিজীবীর কাছে ভারত কেবল একটি প্রশাসনিক কাঠামো নয়; এটি একটি নৈতিক সমস্যা। তাদের ভাষায় শাসনব্যবস্থা মানেই দমন, আর তার বিরোধিতা মানেই ন্যায়। এই সরলীকরণ এতটাই গভীর যে, রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্যে তারা বিপদ দেখেন না— বরং তাকে 'প্রতিকারমূলক অভিব্যক্তি' বলে ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু এখানেই সবচেয়ে বড়ো বিপদ লুকিয়ে আছে। ইতিহাস সাক্ষী— বিচ্ছিন্নতাবাদ কখনো প্রথমে বন্দুক হাতে আসে না। আসে বুদ্ধিবৃত্তিক ন্যারিটিভ নিয়ে। যখন শিক্ষিত সমাজের একাংশ দেশবিরোধী ভাষাকে নীরবে মেনে নেয়, তখন সেই ভাষা ধীরে ধীরে মূলধারায় ঢুকে পড়ে। আজ যা 'স্লোগান', কাল তা 'রাজনৈতিক দাবি', আর পরশু তা 'অধিকার আন্দোলন' হয়ে দাঁড়ায়।

বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা মোটেই শুভ নয়। এটি এক ধরনের Passive Endorsement— নীরব সমর্থন। তারা সরাসরি কিছু না বলেও একটি স্পষ্ট বার্তা দেন— 'এই ধরনের ভাষা গ্রহণযোগ্য।' তাদের এই মানসিকতাই সবচেয়ে বিপজ্জনক।

কারণ সাধারণ ছাত্র বা তরুণ নাগরিক যখন দেখে— দেশের নামি অধ্যাপক, লেখক বা চিন্তাবিদেরা এই বিষয়ে নীরব— তখন সে ধরে নেয়, নিশ্চয়ই এতে তাদের সমর্থন রয়েছে। এই ভাবেই দেশবিরোধী উগ্র মতাদর্শ সামাজিক বৈধতা পায়। সবচেয়ে বড়ো পরিহাস হলো— এই বুদ্ধিজীবীরাই আবার গণতন্ত্র, সহনশীলতা ও বহুত্ববাদের কথা বলেন। অথচ তারা ভুলে যান, গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত সরকারের অস্তিত্ব। সরকার না থাকলে অধিকার থাকে না, সংবিধান থাকে না, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও থাকে না। দেশকে প্রশ্ন করা আর সরকারকে অস্বীকার করার মধ্যে যে সূক্ষ্ম কিন্তু মৌলিক পার্থক্য, তা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঝাপসা করে দেন।

এই কারণেই আজ প্রশ্ন উঠছে— এই নীরবতা কি বুদ্ধিবৃত্তিক সততা নাকি মতাদর্শগত সুবিধাবাদ? যে সমাজে বুদ্ধিজীবীরা প্রশ্ন করার বদলে নির্বাচিত নীরবতা পালন করেন, সেই সমাজে উগ্র শক্তির জন্য পথ খোলা হয়ে যায়। ইতিহাসে এর ফল কখনো শুভ হয়নি।

রাষ্ট্রবিরোধী ভাষা যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক হয়, আর বুদ্ধিজীবীরা তখন নীরব থাকেন, তখন সেই নীরবতাই দেশবিরোধিতার সবচেয়ে জোরালো বক্তব্য হয়ে ওঠে। আজ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে সংকট, তা শুধু ছাত্র রাজনীতির নয়— এটি বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্বহীনতার সংকট। □

ভাতার রাজনীতি বন্ধ হোক

এমন নারীভাতা, নারী-সুবিধা বিশ্বের কোনো দেশে নেই। দেশে কেন্দ্রীয় সার্বজনীন ভাতা আইন হোক! লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইন ও সমাজ হোক! ভাতা প্রাপক তারাই হোক, যারা অসুস্থ, গরিব বা এক সন্তানের বাবা-মা। যে নিজে খেতে পারে না, সে কেন একাধিক সন্তানের জন্ম দেবে? কে তার ভরণ-পোষণ দেবে? ভারতে গড়ে আয়কর দেয় ২ শতাংশ নাগরিক, সেখানে জার্মানিতে গড়ে আয়কর দেয় ৫৬ শতাংশ নাগরিক। ভারতে প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ খাদ্য-সহায়তা পায়, সেখানে জার্মানিতে প্রায় ৬ শতাংশ। তাদের বেশিরভাগই বৃদ্ধ বা সিঙ্গেল-মাদার ফ্যামিলি। ভারতে যে ফ্যামিলিতে মাথাপিছু গড়ে গ্রামে ৪ হাজার, শহরে ৫ হাজার টাকা আয় আছে, তারা ভাতার যোগ্য কেন হবে? আর যদি ভাতা পায়, ফ্যামিলি পাবে— কোনো পুরুষ বা নারী, ছাত্র বা ছাত্রী কেন আলাদাভাবে পাবে? তা মিলুক এক সন্তানের মা, একা থাকে, গরিব কিংবা আয়ের ক্ষমতা নেই অসুস্থ— এমন ব্যক্তিকে। যে নিজে খেতে পারে না, সে কেন বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে সেই সন্তানকে দেশের বোঝা বানাবে? দেশে কেন্দ্রীয় আইন হোক— যে ফ্যামিলির মাথাপিছু আয় মাসে ৫ হাজার টাকার কম, তাদের একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ভাতা বা খাদ্য-সহায়তা দেওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নারীভাতার মতো হুবহু বা সরাসরি শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে আজীবন নগদ টাকা দেওয়ার কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা বিশ্বের অন্য কোনো দেশে সেভাবে নেই। সরাসরি এবং শুধুমাত্র নারীদের জন্য বাসভাড়া সম্পূর্ণ ফ্রি করার এমন নিয়ম ভারতের বাইরে বিশ্বের অন্য কোনো দেশে সাধারণত দেখা যায় না। বিশ্বের অন্য কোনো দেশে ভারতের মতো আইন করে গ্রামীণ নাগরিকদের জন্য ঠিক ১২৫ দিনের নির্দিষ্ট কাজের গ্যারান্টি বা আইনি অধিকারের কোনো প্রকল্প নেই। পশ্চিমি দেশগুলোতে সরকার কোনো ব্যক্তিকে নিজের বাড়ি বানানোর জন্য টাকা দেয় না। একদিকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ফ্রি, অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ৫ লক্ষ টাকা ফ্রি বেসরকারি চিকিৎসা বিল সরকার মেটায় না। উন্নত দেশে প্রত্যেক নাগরিককে মেডিক্যাল ইন্সুরেন্স করতে হয়, সরকার অতি গরিবদের মাসিক ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম দিয়ে দেয়।

নারীদের সুরক্ষায় অনেক শক্তিশালী আইন বিশ্বের মধ্যে একমাত্র ভারতে আছে। ভারতে পুরুষরাও আইনত খারাপ অবস্থানে আছে। সরকার কি নারী-পুরুষের সমান অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের দেশ বানাতে চায় না নারীকেন্দ্রিক দেশ বানাতে চায় না লিঙ্গ নিরপেক্ষ বৈষম্য বিরোধী ভারত বানাতে চায়? তেলাপোকারা যে কখন কী আন্দোলন করবে, সরকার বুঝতে পারছে না। মমতা, কেজরিওয়ালরা কি আসলেই দেশবিরোধী কাজ করেনি? এদের করা ঋণ কে কবে কীভাবে শোধ করবে? কেন উত্তর-পুরুষরা বা নাবালকরা ঋণের দায় নেবে? তারা এসব প্রকল্প শুরু করেছিল দেশকে দেউলিয়া করতে। সরকার কি ভাতা দিয়ে দেশকে দেউলিয়া করতে চায়, নাকি সার্বজনীন আইন করতে চায়? ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এটা ভাবতে হবে।

—মৃণাল মজুমদার,
বার্লিন, জার্মানি।

অন্নপূর্ণা যোজনা ও বার্ধক্য ভাতা

এই চিঠির উদ্দেশ্য সরকারকে হেয় করা নয়; বরং সরকারি কিছু পদক্ষেপের অসঙ্গতি তুলে ধরা। প্রথম কথা, 'অন্নপূর্ণা যোজনা' ও 'বার্ধক্য ভাতা'র মধ্যে কোনটি অধিক জরুরি? অবশ্যই 'বার্ধক্য ভাতা'। কারণ সারা রাজ্যে এমন প্রচুর সহায়-সম্বলহীন এবং নানাপ্রকার বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা আছেন। ফলে তাদের নিয়মিত ওষুধ না কিনলেই নয়। অথচ তাঁদের জন্য ধার্য্য এবং বর্ধিত ভাতার পরিমাণ ১৫০০ টাকা। অথচ সেই ভাতা কিন্তু তাঁরা এখনও পাননি। পাশাপাশি 'অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা কেউ ১ম মাসে, কেউ ২য় মাসে, কেউ কেউ ইদানীং পেলেও না পাবার অভিযোগের কিন্তু অন্ত নেই। এখন প্রশ্ন হলো, এত অসঙ্গতি কেন? কেন যোগ্যদের সঠিক তালিকা তৈরি না করেই তাড়াহুড়া করে ভাতা দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? সরকারের তরফে হয়তো বলা হবে— নির্বাচনের আগে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সরকার কি সেই প্রতিশ্রুতি সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছে? না— পারেনি। পারা সম্ভবও না। কারণ বিগত সরকার বিভিন্ন ভাতা নিয়ে যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে গেছে— তাকে সরকারি অর্থের 'হরিরলুট' বললেও কম বলা হয়। তাই প্রতিশ্রুতি দেবার আগে ভাবা উচিত ছিল নিশ্চয় ? আর এক মাসের মধ্যে ভাতা না দিয়ে সুষ্ঠুভাবে ঠাণ্ডা মাথায় রাজ্যব্যাপী যোগ্যদের সঠিক তালিকা তৈরি করে তবেই ভাতার টাকা পাঠানো উচিত ছিল না কি?

এমন অজস্র যোগ্য মহিলা আছেন যারা ভাতা না পেয়ে সারা রাজ্যব্যাপী যে বিক্ষোভ শুরু করেছেন— সেটা কি কাম্য ছিল? ভুলে গেলে চলবে না— বিরোধীরা কিন্তু এ ব্যাপারে ভীষণ সক্রিয়। তাঁরা কোমর বেঁধে বঞ্চিতাদের উসকানি দিতে মাঠে নেমে পড়েছে। সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি কি এতে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়ছে না?

এটা স্বাভাবিক যে, পাশের বাড়ির মহিলা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপূর্ণা হয়েও তিনি পেলেন— আর আমি পেলাম না? তার উপর সামনেই দুর্গাপূজা। অতএব সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করতে যদি কিছু দেরিও হয় তবু সেটা বরং ভালো, তবু অপরিকল্পিতভাবে কাজ করতে গেলে সরকার বাহাদুর কিন্তু সমালোচনা থেকে রেহাই পাবে না। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

—বিনয় কৃষ্ণ দাশ,
উত্তমাশা, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর।

প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা

এবছর রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতকার্যদের মধ্যে আমার মেয়েও একজন।

ফঃ ৩

স্বাভাবিকভাবেই কাউন্সেলিং পর্ব শুরু হওয়ার পর আমাদের প্রত্যাশা ছিল, প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে মেয়ের পছন্দের কলেজ ও কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু বাস্তবে একটি ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করাই হয়ে উঠল এক দীর্ঘ ও দুর্বিষহ প্রশাসনিক পরীক্ষার নাম।

কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার পর জানা গেল, কলেজে ভর্তি হওয়া কিংবা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অ্যান্ড আপগ্রেডেশনের জন্য আবেদন করতে হলে প্রার্থীর ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রয়োজন। সেই মতো নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টালে বাড়ির দলিল থেকে শুরু করে একাধিক নথি স্ক্যান করে আপলোড করি এবং প্রার্থী সম্পর্কিত চাওয়া সমস্ত তথ্য দিয়ে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করি। এরপর শুরু হয় সরকারি অফিসে এক দপ্তর থেকে আর এক দপ্তরে ছোটোছুটির পালা। মহকুমা শাসকের অফিসে দু'দিন যাওয়ার পর একটি মেমো নম্বর দিয়ে থানায় যেতে বলা হয়। থানায় গিয়ে সমস্ত তথ্য জানানোর পর আবার একাধিক নথি চাওয়া হয়। এমনকী প্রার্থীকে থানায় নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট আধিকারিকের সামনে বসে পুনরায় আবেদনপত্র লিখতেও বলা হয়। কয়েকদিনের যাতায়াতে থানায় প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আবার মহকুমা শাসকের অফিসে যেতে বলা হয়। সেখানে ফের একাধিক নথিপত্র চাওয়া হয়— বাড়ির দলিল থেকে শুরু করে প্রার্থী ও তাঁর পরিবারের নানা তথ্য।

প্রশ্ন জাগে, একটি ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য একই নাগরিককে এতগুলি দপ্তরে, এতবার নথিপত্র নিয়ে ছুটতে হবে কেন? প্রযুক্তির এই যুগে যদি একজন নাগরিককে একই তথ্য ও নথি বারবার বিভিন্ন দপ্তরে জমা দিতে হয়, তাহলে অনলাইন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই-বা কী? সমস্ত নথি যদি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একবার জমা নেওয়া যায় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি নিজেদের মধ্যে তথ্য যাচাই করে নিতে পারে, তাহলে নাগরিকের এই হয়রানি অনেকটাই কমানো সম্ভব। একটি সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য নাগরিককে কেন দপ্তরগুলির মধ্যে 'বার্তাবাহক'-এর ভূমিকা পালন করতে হবে?

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, এই প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার সরাসরি প্রভাব পড়েছে একটি ছাত্রীর শিক্ষাজীবনে। কাউন্সেলিঙের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে আসায় ডোমিসাইল সার্টিফিকেট হাতে না পেয়েই নির্ধারিত কলেজে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অ্যান্ড আপগ্রেডেশনের জন্য আবেদন করতে হয়। সার্টিফিকেট না থাকায় তাকে 'আউট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে পরবর্তী কাউন্সেলিঙের হোম স্টেট কোটার সুবিধা পাওয়া যায়নি। পছন্দের কোর্স বা স্ট্রিম না পাওয়ায় শেষপর্যন্ত কোথাও ভর্তি হওয়াও সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার বিলম্বের মাশুল দিতে হলো একজন ছাত্রীর একটি গোটা শিক্ষাবর্ষ দিয়ে। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয়, দীর্ঘ প্রায় এক মাস এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ছুটে বেড়ানোর পর ডোমিসাইল সার্টিফিকেটটি যখন হাতে এলো, তখন তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। যে শংসাপত্রটি সময়মতো পাওয়া গেলে একটি শিক্ষাবর্ষ বাঁচতে পারত, সেটিই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পরে পাওয়া গেল। প্রশ্নটি তাই শুধু আমার মেয়ের নয়। এ প্রশ্ন রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের। একটি প্রশাসনিক শংসাপত্র কি নাগরিকের অধিকার, নাকি সেটি পাওয়ার জন্য নাগরিককে একটি দুর্বিষহ পরীক্ষায় বসতে হবে?

প্রসঙ্গত, এ রাজ্যে নিট পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদেরও কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হবে। প্রশ্ন হলো, যাঁরা আগামীদিনে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশের মানবসম্পদে পরিণত হবেন, সরকার যদি তাঁদের নাগরিকত্ব ও বসবাসের প্রমাণের জন্য এত দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করে, তাহলে সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে এই ভোগান্তির মাত্রা কতটা হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই প্রশ্নটি ডোমিসাইল সার্টিফিকেটেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সরকারি শংসাপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে নাগরিককে যে পরিমাণ দৌড়ঝাঁপ, নথিপত্রের পুনরাবৃত্তি এবং প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তার প্রকৃত যন্ত্রণা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। সরকারের কাছে নাগরিকের পরিচয় ও তথ্য যাচাইয়ের প্রয়োজন থাকতেই পারে। কিন্তু সেই যাচাইয়ের পুরো দায় যদি নাগরিকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে নাগরিক পরিষেবা আর পরিষেবা থাকে না— তা হয়ে ওঠে নাগরিকের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা।

যে কঠিন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একজন ছাত্র ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিঙে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করে, তার চেয়েও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি শংসাপত্র সংগ্রহের পরীক্ষা। পার্থক্য একটাই— প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দিষ্ট সিলেবাস আছে, নির্দিষ্ট তারিখ আছে, ফল প্রকাশের সময়সীমা আছে; শংসাপত্র সংগ্রহের পরীক্ষায় সেসব কিছুই নেই। আছে শুধু অনিশ্চয়তা, দপ্তর থেকে দপ্তরে ছোটাছুটি এবং হয়রানি। সরকার পাল্টেছে, প্রশাসনের কর্মীরা তো আর পালটায়নি। তাই উলুখাগড়াদের ভোগান্তি বোধহয় শেষ হওয়ার নয়।

—**অজয় ভট্টাচার্য,**
বনগাঁ, উঃ ২৪ পরগনা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হোক শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

১৯০৫-০৬ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যা আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ দেশীয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ধারায় সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা। শিক্ষার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের উদ্যোগেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ। খুবই দুর্ভাগ্যের যে, এই প্রতিষ্ঠান আজ দেশবিরোধিতার আঁতুড়ঘর। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন, বর্তমান প্রজন্মকে এই মহান প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ইতিহাস অবগতির জন্য এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হোক শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়।

—**সৌরভ মহাপাত্র,** সিমলাপাল, বাঁকুড়া।

দশভুজা নারী

সংসার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজ নির্মাণে অনন্য ভারসাম্যের প্রতীক

অরুণা রায় চৌধুরী

একুশ শতকের বিশ্বে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি শব্দ বারবার ফিরে আসে— 'দশভুজা'। পৌরাণিক বিশ্বাসে মা দুর্গা দশটি হাতে যেমন অসুর বিনাশ ও সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন, তেমনি আধুনিক সমাজের নারীও প্রতিদিন একাধিক ভূমিকা একসঙ্গে পালন করে চলেছেন। তিনি একদিকে মা, কন্যা, স্ত্রী, পুত্রবধূ কিংবা পরিবারের অভিভাবক; অন্যদিকে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রশাসক, উদ্যোক্তা, বিজ্ঞানী, শ্রমিক, শিল্পী অথবা কর্পোরেট পেশাজীবী। এই বহুমাত্রিক দায়িত্ব সফলভাবে সামলানোর মধ্য দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক সময়ের 'দশভুজা নারী'।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক হলো নারীর অংশগ্রহণ। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাংকিং, প্রশাসন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নারীদের অবদান আজ জাতীয় অর্থনীতির চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন দারিদ্র্য হ্রাসও পারিবারিক কল্যাণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের পাশাপাশি নারীর ওপর পারিবারিক দায়িত্বের চাপও কম নয়। ভোরের আলো ফোটার আগেই শুরু হয় তাঁদের কর্মব্যস্ততা। পরিবারের জন্য রান্না, সন্তানদের স্কুলের প্রস্তুতি, বয়স্ক সদস্যদের পরিচর্যা, গৃহস্থালির নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করে তাঁকে আবার ছুটতে হয় কর্মস্থলে। অফিসের নির্ধারিত দায়িত্ব, সময়সীমা, লক্ষ্যপূরণ এবং পেশাগত প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করে দিনের শেষে ফিরে এসে আবার পরিবারের দেখভাল করতে হয়। অর্থাৎ কর্মঘণ্টা শেষ হলেও তাঁর দায়িত্ব শেষ হয় না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দ্বৈত দায়িত্ব নারীদের জীবনের অন্যতম বড়ো বাস্তবতা। তবুও অসাধারণ ধৈর্য, সময় ব্যবস্থাপনা এবং মানসিক দৃঢ়তার মাধ্যমে তাঁরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন। অনেক নারী কর্মজীবনের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন, নিজস্ব ব্যবসা গড়ে তুলছেন কিংবা সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডেও যুক্ত থাকছেন। ফলে তাঁরা কেবল পরিবারের উন্নয়নেই নয়, জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

নারীর এই বহুমাত্রিক ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সন্তান প্রতিপালন ও মূল্যবোধ গঠন। একজন মা শুধু সন্তানের জন্মদাত্রী নন, তিনি তাঁর প্রথম শিক্ষকও। শিশুর ভাষা, আচরণ, নৈতিকতা, সামাজিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি গড়ে ওঠে পরিবারে, আর সেই ভিত্তি নির্মাণে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষিত ও সচেতন মায়েরা পরিবারে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল যুগ নারীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বর্তমানে অসংখ্য নারী ঘরে বসেই অনলাইন ব্যবসা, ফ্রিল্যান্সিং, কনটেন্ট ক্রিয়েশন এবং ডিজিটাল মার্কেটিঙের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের বিস্তারের ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোগও এখন বৃহৎ বাজারে পৌঁছানোর সুযোগ পাচ্ছে। ফলে পরিবার ও কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে অনেক নারী নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করছেন।

তবে এই অগ্রযাত্রার পথে এখনো কিছু প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য, সমান কাজের জন্য অসম বেতন, নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক কুপ্রথা এবং গৃহস্থালির কাজের অসম বণ্টন অনেক নারীর জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তাই নারীর ক্ষমতায়ন শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করলেই হবে না, প্রয়োজন পারিবারিক সহযোগিতা, সামাজিক সচেতনতা এবং নীতিগত সমতা নিশ্চিত করা। পরিবারে কাজের দায়িত্ব ভাগাভাগি এবং কর্মক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল পরিবেশ নারীর অগ্রযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। আজকের নারী কেবল নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য সংগ্রাম করছেন না, তিনি পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নেরও অংশীদার।

মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে শাসন পরিচালনা, আন্তর্জাতিক কূটনীতি থেকে ক্রীড়াঙ্গন— প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা তাঁদের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন। তাঁদের সাফল্য নতুন প্রজন্মের মেয়েদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে এবং সমাজকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রগতিশীল করে তুলছে।

দশভুজা নারীর পরিচয় কোনো অলংকারমূলক উপমা নয়, এটি তাঁর প্রতিদিনের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। অসংখ্য দায়িত্ব, সীমাহীন ব্যস্ততা এবং নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যেও তিনি হাসিমুখে এগিয়ে চলেন। তাঁর ত্যাগ, পরিশ্রম, মমতা, নেতৃত্বগুণ এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। নারীর অগ্রগতি ঘটলে পরিবার এগোয়, সমাজ এগোয়, দেশ এগোয়, আর সেই অগ্রযাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছেন আমাদের সময়ের অসংখ্য দশভুজা নারী। □

গ্লুকোমা নিয়ে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো সচেতনতার অভাব

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

চোখ ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু হলো অপটিক নার্ভ। গ্লুকোমা হলে এ স্নায়ুটি ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিশক্তি কমে আসে। অনেক সময় কোনো পূর্বলক্ষণ ছাড়াই এই রোগ দেখা দিতে পারে। যেকোনো বয়সে গ্লুকোমা হতে পারে, তবে ৪০ বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তি এবং যাদের পরিবারে গ্লুকোমার ইতিহাস আছে, তাঁদের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। সময়মতো চিকিৎসা শুরু না করলে এ রোগ অন্ধত্বের কারণ হতে পারে।

গ্লুকোমায় আক্রান্ত হলে চোখের ভেতরে তরল নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি হয় এবং চাপ বেড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে চোখ লাল হওয়া, জল পড়া ও হালকা ব্যথা থাকতে পারে। পরবর্তী সময়ে দৃষ্টিশক্তি কমে আসা, মাথাব্যথা, বমিভাব ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

আলোর চারপাশে রামধনুর মতো ছটা দেখা, যাকে বলা হয় রেনবো হ্যালো। এটা রোগের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সামনের দৃষ্টি অনেক সময় স্বাভাবিক থাকলেও পার্শ্বীয় দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে 'টানেল ভিশন'-এ রূপ নেয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রেসবায়োপিয়া বা নিকটদৃষ্টির পাওয়ারেও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

চোখের ভেতরের 'অ্যাকুয়াস হিউমার' নামে তরল চোখের গঠন অটুট রাখে এবং পুষ্টি সরবরাহে সহায়তা করে। এই তরল ট্র্যাবেকুলার মেশওয়ার্ক নামক সূক্ষ্ম টিস্যুর মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। ওপেন-অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমায় এই নিষ্কাশন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে তরল জমে গিয়ে চোখের ভেতরে চাপ বাড়ে এবং অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার কখনো স্বাভাবিক আইওপি থাকা সত্ত্বেও অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যাকে স্বাভাবিক টেনশন গ্লুকোমা বলা হয়।

পরিবারে গ্লুকোমার ইতিহাস, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা চোখে আঘাত এবং দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন ঝুঁকির কারণ হতে পারে। নিওভাসকুলার গ্লুকোমায় চোখে স্বাভাবিক নতুন রক্তনালি তৈরি হয়ে তরল নিষ্কাশনে বাধা দেয়, যা সাধারণত ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের জটিলতায় ঘটে। পিগমেন্টারি গ্লুকোমায় আইরিস থেকে পিগমেন্ট ঝরে গিয়ে তরল চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ছানি বা টিউমারের সমস্যাও গ্লুকোমার কারণ হতে পারে।

গ্লুকোমা পুরোপুরি প্রতিরোধ করা না গেলেও দ্রুত শনাক্ত ও চিকিৎসার মাধ্যমে অপটিক স্নায়ুর ক্ষতি ও অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে ভিজ্যুয়াল ফিল্ড উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত অনেক সময় রোগ শনাক্ত করা কঠিন হয়। চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে চোখের ড্রপ, লেজার ও শল্যচিকিৎসা।

ওপেন-অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমায় প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন-জাতীয় ড্রপ, আলফা-অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্ট, বেটা-ব্লকার, মাস্কারিনিক রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট (যেমন পিলোকারপিন) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী লেজার বা আধুনিক শল্যচিকিৎসা (এক্সপ্রেস শান্ট ইমপ্লান্টেশন) করা হয়। ওপেন-অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমায় সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি বা আজীবন চিকিৎসা প্রয়োজন, আর ক্লোজড-অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে লেজার চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায়।

ভবিষ্যতে অপটিক স্নায়ু পুনরুদ্ধার বা সংযোজনভিত্তিক চিকিৎসা সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারে। গ্লুকোমা সম্পর্কে জানুন, নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। গ্লুকোমা সম্পর্কে তেমন কোনো প্রচার নেই। অনেক মানুষের তাই এই রোগ সম্পর্কে ধারণা কম। ফলে সচেতনতার অভাবে এক বিরাট জনগোষ্ঠী অপরিবর্তনযোগ্য অন্ধত্বের শিকার হন।

স্থায়ীভাবে এ রোগের কোনো প্রতিকার নেই। প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। প্রথমেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। শরীরের রক্তের যেমন নির্দিষ্ট প্রেসার আছে, তেমনি চোখেরও নির্দিষ্ট প্রেসার আছে। এর মাত্রা থাকবে ১০ থেকে ২১ মিলিমিটার মার্কারি। যদি প্রেসার এই মাত্রায় থাকে, তাহলে এটিকে বলে চোখের স্বাভাবিক প্রেসার। কোনো কারণে যদি এ প্রেসার ২১ মিলিমিটার মার্কারির বেশি হয়, তাহলে চোখের যে নার্ভ দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে, সে নার্ভের ক্ষয় হওয়া শুরু হয়। ফলে রোগী চোখে কম দেখতে শুরু করেন। চোখের প্রেসার বেড়ে যাওয়ায় অপটিক নার্ভের ক্ষয় হওয়া এবং রোগী চোখে কম দেখাকে সমন্বিতভাবে বলা হয় গ্লুকোমা।

রোগের লক্ষণ : গ্লুকোমার প্রকারভেদের ওপর রোগের লক্ষণ নির্ভর করে। তিন ধরনের গ্লুকোমা দেখতে পাওয়া যায়। প্রাইমারি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা, ন্যাড়া অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা এবং কনজেনিটাল গ্লুকোমা। সাধারণত ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা উপসর্গহীন। রোগী আক্রান্ত হলেও বলতে পারেন না। রোগী যখন ডাক্তারের কাছে আসেন, তখন ধরা পড়ে। যেমন চোখের প্রেসার বেড়ে যাওয়া, অপটিক নার্ভের ক্ষয় হয়ে ভেতরে কাফিং দেখা যাওয়া এবং রোগীর দৃষ্টি ব্যাপ্তি সংকুচিত হওয়া। অন্যদিকে ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার লক্ষণ হলো চোখে ব্যথা হওয়া, লাল হওয়া। কনজেনিটাল গ্লুকোমা শিশুদের হয়ে থাকে। এর লক্ষণ জন্মের পরেই শিশুর চোখ বড়ো হয়ে যাওয়া, চোখ থেকে জল পড়া এবং রুমের লাইট জ্বালালো হলে শিশু চোখ বন্ধ করে ফেলে। গ্লুকোমা নিরাময়যোগ্য না হলেও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো এবং রোগের চিকিৎসা সারাজীবন করে যেতে হবে। দৃষ্টি যাতে আর কমে না যায়, তার জন্য চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৩০ আগস্ট বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ৬৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো কলকাতা সূর্য সেন স্ট্রিটের নির্মল ভবনের সভাকক্ষে। এদিন সকাল ১০টায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্ সং বো মনাংসি জানতাম্' বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে সভার শুভারম্ভ হয়। মঞ্চসীন ছিলেন বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী, সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম সিংহরায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল এবং কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক রমেশ সরাওগী। সদ্য প্রয়াত সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুনীল মুন্সীর পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে নীরব প্রার্থনার পর স্বাগত ভাষণ রাখেন অজয় নন্দী।

এরপর বার্ষিক কার্যবিবরণীর প্রতিবেদন পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম সিংহ রায়। তিনি উল্লেখ করেন গত ১ বছরে সমিতির উদ্যোগে ১৩টি শিবিরে ১৫২৫ জনের চক্ষু পরীক্ষা হয়। তারমধ্যে ১২৮০ জনকে নিঃশুল্ক চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩০৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। ছাত্রবৃত্তি ও পুস্তক কেনায় সহায়তা প্রদান করা হয় ৩০ ছাত্র-ছাত্রীকে। ৯ জনকে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়। সামান্য সংশোধনীর পর উপস্থিত সকলেই ওঙ্কার ধ্বনির দ্বারা প্রতিবেদনকে সমর্থন জানান। গত বছরের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ উজ্জ্বল ঘোষ। এই প্রতিবেদনও সকলেই ওঙ্কার ধ্বনির মাধ্যমে সমর্থন জানান।

এরপর সমিতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সমিতির সভাপতি সমিতি ভেঙে দিলে সকলেই মঞ্চ থেকে নেমে সদস্যাসনে বসে পড়েন। আগামী বছরের সমিতি গঠনের জন্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে রমেশ সরাওগীর নাম প্রস্তাব করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। সমর্থন করেন অজয় নন্দী। নির্বাচনে পুনরায় অজয় নন্দী সভাপতি, অরিন্দম সিংহ রায় সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ উজ্জ্বল ঘোষ নির্বাচিত হন। সদস্য হিসেবে পরমানন্দ শর্মা, রঞ্জন সেন, দিনেশ পেরিওয়াল, শিবদাস বিশ্বাস, নিরাপদ পাল, সন্দীপ সরদার, সারদাপ্রসাদ পাল, শশাঙ্ক শেখর দে এবং আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে বিজয় আঢ্য, ডাঃ দীপঙ্কর পতি, পার্থপ্রতিম মুন্সী, বিশ্বনাথ নন্দী, বিশ্বজিৎ সরকার, জীবনময় বসু, ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম, তপন নাগ, রমাপদ পাল জলধর মাহাত, প্রশান্ত ভট্ট ও পারিজাত গুহ মজুমদার মনোনীত হন। উপস্থিত অন্যান্যরা নবগঠিত সমিতিকে সাধুবাদ জানান।

এরপরেই জলধর মাহাত তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি স্থাপনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে সমিতিকে আরও ব্যাপক সেবাকাজ পরিচালনার বার্তা দেন। এরপর উপস্থিত প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অদ্বৈতচরণ দত্ত। সভা সঞ্চালনা করেন উজ্জ্বল ঘোষ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সারদাপ্রসাদ পাল। শান্তিমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidery
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

সক্ষম, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে দৃষ্টিহীনদের রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা

সক্ষম, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে এবং অল বেঙ্গল ব্রেইল চেস অ্যাসোসিয়েশন ও ক্রীড়া ভারতীর সহযোগিতায় গত ২৮,২৯,৩০ আগস্ট কলকাতার বরানগর সন্নিহিত বনহুগলীর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিসএবিলিটিস আডিটোরিয়ামে তিনদিন ব্যাপী ‘দৃষ্টিহীনদের জন্য সারা বাংলা রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা’র আয়োজন করা হয়। এবারের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ১২০ জম দৃষ্টিহীন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করেন। ছেলে ও মেয়ে উভয়

বিভাগের প্রতিযোগী ছিলেন। ২৮ আগস্ট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ভারতের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার দিবেন্দু বড়ুয়া। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, সক্ষমের অখিল ভারতীয় সভাপতি ডাঃ দয়াল সিংহ পাওয়ার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদা প্রসাদ পাল, প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেরা নাচ,গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। তৃতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, সক্ষমের অখিল ভারতীয় সভাপতি ডাঃ দয়াল সিংহ পাওয়ার, সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে এবং কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক রমেশ সরাওগী। সভাপতিত্ব করেন সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম। তিনি বলেন, ১২০ জন প্রতিযোগীর এই লড়াই আমাদের শিক্ষা দিল— দৃষ্টি চোখে নয়, মনে থাকে। যারা আজ বিজয়ী হলেন তাদের অভিনন্দন; যারা হলেন না তারাও আমাদের প্রেরণা।’ পুরস্কার বিতরণ এবং জাতীয় স্তরের জন্য নির্বাচিত দলকে সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে তিনদিনের এই মহোৎসবের সমাপ্তি ঘটে

সাঁকরাইল ব্লক ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে সাঁতার প্রশিক্ষণ

গত ২৩ আগস্ট হাওড়া জেলা সাঁকরাইল ব্লক ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে ধুলাগড়ীতে সাঁতার প্রশিক্ষণ (Sports Swimming)-এর আয়োজন করা হয়। গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নেশামুক্ত ও মোবাইল ফোনের আসক্তি কাটাতে, সাঁতার প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এবং সাঁতারু তৈরি করে ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ৩০ ছেলে-মেয়ে এবং কয়েকজন অভিভাবক এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর হাওড়া জেলার সভাপতি বিশিষ্ট সাঁতারু আশিস ব্যানার্জী এবং জাতীয় খেলোয়াড় সাঁতারু তমাল মজুমদার। ক্রীড়া ভারতীর বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার উপস্থিত থেকে এই প্রশিক্ষণ পর্ব পরিচালনা করেন।

মালদহ জেলার হবিবপুর ও বামনগোলায় ক্ষত্রিয় সমিতির বৈঠক

গত ২৩ আগস্ট মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের কেন্দপুকুরে উড়ান লজে ক্ষত্রিয় সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির মালদহ জেলার সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, সম্পাদক ভূপেশ চন্দ্র বর্মন, সহ-সম্পাদক সৌমিক বর্মন, জেলা সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা ডাঃ ফণীভূষণ রায়, জেলা সমিতির সদস্যা শ্রীমতী জয়ন্তী রায় এবং কেন্দ্রীয় সদস্য তপন কুমার সরকার। বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয় এবং রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার বিষয়ে সকলেই বক্তব্য রাখেন।

এরপরে একই বৈঠক বামনগোলা ব্লকের পাকুয়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। দুই ব্লকের জন্য একটি সমিতি ঘোষণা করেন জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার। হবিবপুর ব্লকের সভাপতি দেবাশিস বর্মন, সম্পাদক নির্মল রায়, সদস্য রানার বর্মন, হীরালাল রায় ও মধুসূদন রায় মনোনীত হন। বামনগোলা ব্লকের সভাপতি মিঠুন রায়, সহ-সভাপতি বিকাশ মণ্ডল, সম্পাদক সুভাষ মণ্ডল, সহ-সম্পাদক ধনঞ্জয় মণ্ডল, কোষাধ্যক্ষ বলরাম মণ্ডল, সক্রিয় সদস্য মিলন সরকার, অঙ্কারেশ মণ্ডল, দেবু মণ্ডল, তাপস মণ্ডল, অলোক মণ্ডল, শ্রীমতী ঊষা মণ্ডল মনোনীত হন। উপস্থিত সবাইকে সমিতির সদস্য ঘোষণা করা হয়।

দুর্গাপূজার সাত্ত্বিকতা রক্ষার লক্ষ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাংবাদিক সম্মেলন

গত ২৬ আগস্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার-প্রসার বিভাগের আহ্বানে পূর্ব কলকাতায় বিধাননগর-স্থিত পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ঐকতান সভাগৃহে একটি আলোচনাসভা ও সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার দুর্গাপূজার সাত্ত্বিকতা, কলকাতার

ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজার ধর্মীয় ও সাত্ত্বিক ভাবধারা, পবিত্রতা ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী সংগঠন বৈঠক ও প্রেস বৈঠকের আয়োজন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় সাধুসন্ত ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ববর্গ, 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব কমিটি'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, কলকাতার বিভিন্ন দুর্গাপূজা কমিটির প্রতিনিধি ও সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত পুরোহিত ও আচার্যবৃন্দ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা। কলকাতার দুর্গাপূজার সাত্ত্বিকতা রক্ষার লক্ষ্যে এদিনের কার্যক্রমে উপস্থিত সকলকে বার্তা দেন পূজনীয় শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। তিনি বলেন যে, দুর্গাপূজা শুধুমাত্র উৎসব নয়— দুর্গাপূজা বাঙ্গালির ধর্মীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের এক পবিত্র প্রকাশ। কলকাতার দুর্গাপূজার ঐতিহ্য, সাত্ত্বিকতা ও ধর্মীয় মর্যাদা রক্ষা, পূজার পরিবেশকে আরও পবিত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং আগামীদিনে দুর্গাপূজাকে আরও সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও ধর্মীয় ভাবধারায় সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আয়োজিত হয়েছে বলে পূজনীয় মহারাজ জানান। দুর্গাপূজার সাত্ত্বিকতা রক্ষার লক্ষ্যে সবপক্ষকে সক্রিয় হওয়ার আবেদনও জানান তিনি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, পূর্বক্ষেত্র সম্পাদক অমিয় সরকার ও পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার-প্রসার প্রমুখ রক্তিম দাশ। পারমিতা গুছাইতের কণ্ঠে রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সিউড়ীতে সংস্কার ভারতীর বীরভূম জেলার বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ১৬ আগস্ট ‘সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ’-এর বীরভূম জেলা শাখা তাদের

বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্রতী হয়। এদিন সিউড়ী সিধু-কানু মঞ্চ থেকে ‘স্বদেশ জাগরণ’ নামে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। বহুরূপী, ঘোড়া, নাচ, ঢাক, ঢোল, দাসাইনৃত্য সহযোগে বিভিন্ন প্রকার লোকশিল্পীরা তাদের শিল্প প্রদর্শন করতে করতে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। প্রায় চারশো মানুষের দেশবন্দনার এই পদযাত্রা সিউড়ী রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে সমাপ্ত হয়। এরপর রবীন্দ্রসদনে কবিগুরুর মূর্তির পিছনে ‘স্বদেশ চেতনা’ নামক একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। ‘সার্ধশতবর্ষে বন্দে মাতরম্’—এই বিষয়টিকে সামনে রেখে বীরভূমের ১০ জন গুণী চিত্রশিল্পীর চিত্র এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। চিত্র প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন বীরভূমের বিখ্যাত ভাস্কর ললিতকলা অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী আশিস ঘোষ। সন্ধ্যাকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী, পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত মমতাশঙ্কর মহাশয়া। অনুষ্ঠানমঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ডঃ আশিস গিরি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা অনিমেষ মুখোপাধ্যায় ও শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য ও সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত।

সংস্কার ভারতীর রীতি অনুসারে নৃত্যের মাধ্যমে, ভাবসঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তারপর প্রদীপ প্রজ্বলন, ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং সম্মানীয় অতিথিদের সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে উদ্বোধন সত্রের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কার ভারতীর ৩৬ জন শিল্পী দ্বারা পরিবেশিত হয় সঙ্গীত আলেখ্য ‘স্বদেশ স্পন্দন’। স্বদেশ পর্যায়ের গান ও স্বাধীনতা আন্দোলনে ‘বন্দে মাতরম্’ গানের যে বৈপ্লবিক প্রভাব জনমানসে সঞ্চারিত হয়েছিল— ভাষ্যের মাধ্যমে তা পরিবেশনের মাধ্যমে সাজানো হয় এই গীতি আলেখ্য, যা উপস্থিত দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। সর্বশেষ সত্রে পরিবেশিত হয় নাটক ‘বন্দে জননী ভারতবর্ষ’। যে ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীত স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজমন্ত্র ছিল, স্বাধীন ভারতে সেই গানকেই রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত রূপে নিজস্ব স্থান করে নেওয়ার লড়াই ছিল এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। রবীন্দ্র সদনের মুক্ত প্রাঙ্গণে ‘বন্দে মাতরম্’-এর দীর্ঘ ইতিহাস এবং বিবর্তনের একটি প্রদর্শনীও আয়োজিত হয় যা দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।

মঞ্চসজ্জা, গেটের নির্মাণশৈলী, পোশাক ভাবনা— সবকিছু মিলিয়ে এক অভিনব কার্যক্রমের সাক্ষী থাকলো বীরভূমের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ।

আরোগ্য ভারতীর পূর্বক্ষেত্র চিকিৎসক সম্মেলন

গত ২৩ আগস্ট পূর্ব কলকাতায় বিধাননগরে অবস্থিত রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবনে আরোগ্য ভারতী, পূর্বক্ষেত্রের উদ্যোগে আয়োজিত পূর্বক্ষেত্র চিকিৎসক সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতির মোট ১৪০ জন চিকিৎসক এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন--- অ্যালোপ্যাথির ৮ জন, হোমিওপ্যাথির ৬ জন, ইউনানির ১৫ জন, যোগের ১০ জন এবং আয়ুর্বেদের ১০১ জন চিকিৎসক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৮০ জন চিকিৎসক-শিক্ষার্থী, ১৩ জন আয়ুর্বেদ ফার্মাসিস্ট এবং ৪০ জন কার্যকর্তা। সব মিলিয়ে সম্মেলনে মোট ২৭৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষ ডাঃ রাকেশ পণ্ডিত। তিনি 'এক দেশ, এক চিকিৎসা ব্যবস্থা--- বর্তমান সময়ের দাবি' বিষয়ের ওপর তাঁর বক্তব্য রাখেন। আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক ডাঃ মুরলী কৃষ্ণান 'সুস্থ জীবনশৈলী থেকে সুস্থ ভারত নির্মাণ— আরোগ্য ভারতীর মিশন' বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল 'স্বাস্থ্যসেবা থেকে রাষ্ট্রসেবা' বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুর বিধানসভার বিধায়ক ড. অরূপ কুমার দাস, 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কুদেব পণ্ডা, ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও)-এর ক্ষেত্রীয় সম্পাদক ডাঃ প্রভাত সিংহ, বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থান-এর পরিচালক ডাঃ অভিজিৎ ঘোষ। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। 'পূর্বক্ষেত্রে আরোগ্য ভারতীর কার্য' বিষয়ের ওপর প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন আরোগ্য ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সহ-সংগঠন সম্পাদক রাজেশ কর্মকার। অনুষ্ঠানের শেষে আরোগ্য ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সভাপতি ডাঃ গোপালচন্দ্র কর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সকল প্রতিনিধি ও অংশগ্রহণকারীরা সম্মেলনটি অত্যন্ত উপভোগ করেন এবং সম্মেলনের সার্বিক আয়োজনে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বেলেঘাটায় তিরঙ্গা যাত্রা

গত ১৪ আগস্ট 'অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস' উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এবং এই দিনটিতে জনসাধারণের কাছে 'অখণ্ড ভারত সংকল্প'-এর আদর্শ তুলে ধরতে 'বেলেঘাটা নাগরিক সমাজ'-এর উদ্যোগে এক সুবিশাল 'তিরঙ্গা যাত্রা'র আয়োজন করা হয়। পূর্ব কলকাতায় বেলেঘাটা বিল্ডিং মোড় থেকে এই সুবিশাল তিরঙ্গা যাত্রা শুরু হয়। তিরঙ্গা যাত্রার সম্মুখভাগে ছিল অটোপ্রচার; তারপর ভারতমাতার সুসজ্জিত ট্যাবলো ও সঙ্গীত সহযোগে তিরঙ্গা যাত্রা এগোতে থাকে। রাস্তার দু'ধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল উৎসাহী জনতা। স্থানীয়দের পক্ষ থেকে পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য পানীয় জল ও আমপানার ব্যবস্থা করা হয়। বেলেঘাটা সরকারবাজারে পৌঁছে এই তিরঙ্গা যাত্রা শেষ হয়। এখানে ভারতমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের তিরঙ্গা যাত্রা ও ভারতমাতার পূজন অনুষ্ঠানে স্থানীয় অধিবাসী ও কার্যকর্তা-সহ প্রায় এক হাজার রাষ্ট্রবাদী মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ফ ঃ ৪

আরোগ্য ভারতীর কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ

গত ৯ আগস্ট আরোগ্য ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতায় ভবানীপুরের একল ভবনে একদিনব্যাপী কার্যকর্তা অভ্যাসবর্গ আয়োজিত হয়। সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে আরোগ্য ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ১৬টি জেলা থেকে বিভিন্ন স্তরের প্রায় ১৪০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সমাজের সর্বস্তরে স্বাস্থ্যসচেতনতা গড়ে তোলা এবং একটি সুস্থ, সচেতন ও দায়িত্বশীল সমাজ নির্মাণের উদ্দেশ্যেই এই কার্যকর্তা অভ্যাসবর্গের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কার্যকর্তাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি এবং সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক ডাঃ মুরলী কৃষ্ণান। কার্যকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময়, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যেক কার্যকর্তাকে সমাজের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, প্রাকৃতিক ও সুষম খাদ্যাভ্যাস, যোগ ও ব্যায়াম এবং রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আগামীদিনে আরও সংগঠিতভাবে সমাজসেবামূলক স্বাস্থ্যকর্মসূচি পরিচালনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উপস্থিত কার্যকর্তারা। ভবিষ্যতেও এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বার্তা সমাজের আরও বৃহত্তর অংশে পৌঁছে দেবে— এই প্রত্যাশাই সকলের।

‘SAFFRON SURGE : Making of a Brave, New Bharat’ গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক লোকার্পণ

গত ১১ আগস্ট ‘সিটিজেন্স এমপাওয়ারমেন্ট ফোরাম’-এর উদ্যোগে মধ্য কলকাতায় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স ভবন-স্থিত সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ‘SAFFRON SURGE : Making of a Brave, New Bharat’ গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক লোকার্পণ কার্যক্রম। এদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য ও পূর্বতন সরকার্যবাহ শ্রী সুরেশ (ভাইয়াজী) জোশীর করকমলে হিন্দি সংবাদ সাপ্তাহিক ‘পাঞ্চজন্য’-এর পূর্বতন সম্পাদক শ্রী তরুণ বিজয় রচিত এই গ্রন্থটির লোকার্পণ হয়। ভাইয়াজী বলেন, এই গ্রন্থটি ভারতীয় সভ্যতার পুনর্জাগরণ ও রাষ্ট্রের আত্মশ্রদ্ধার ভিত্তিতে সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের এক অপরূপ গাথা। কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের পূর্বতন রাজ্যপাল শ্রী তথাগত রায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়, তথ্য-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট-এর সহ-সম্পাদিকা ড. দেবদত্তা চক্রবর্তী, সিটিজেন্স এমপাওয়ারমেন্ট ফোরামের ট্রাস্টি অরিন্দম ব্রহ্ম প্রমুখ বিশিষ্টজন। শিল্পীদের কণ্ঠে বেদমন্ত্র পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। অনুষ্ঠানে একক গীত পরিবেশন করেন শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য ও প্রবীর ভট্টাচার্য। সমবেত কণ্ঠে রাষ্ট্রগীত ‘বন্দে মাতরম্’-এর মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ডোমজুড়ে ভারতমাতার পূজন ও রাষ্ট্রধর্মসভা

গত ১৪, ১৫ ও ১৬ আগস্ট হাওড়া জেলায় ডোমজুড়ে বেগড়ি গ্রামে 'বেগড়ি অঞ্চল ভারতমাতা পূজন সমিতি'-র উদ্যোগে আয়োজিত হয় ভারতমাতার পূজা, রাষ্ট্রধর্মসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির। ১৪ আগস্ট সুবিশাল শোভাযাত্রা সহকারে ভারতমাতার প্রতিমা পূজামণ্ডপে আনা হয়। পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজী মাসুম আখতার ভারতমাতার পূজার শুভ উদ্বোধন করেন। এরপর আয়োজিত হয়— ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট-আধারিত গীতি আলেখ্য, নৃত্যানুষ্ঠান ও অর্কেস্ট্রায় দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান। ওঙ্কার ধ্বনি ও একাত্মতা স্তোত্র পাঠের মধ্য দিয়ে ১৫ আগস্টের কার্যক্রমের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা ও রাষ্ট্রীয় ধ্বজ উত্তোলনের পর রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার শপথ নিয়ে 'রক্ষাবন্ধন' অনুষ্ঠিত হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় ভারতমাতার পূজা ও হোমযজ্ঞ। উপস্থিত সকলে ভারতমাতার পাদপদ্মে স্বদেশমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রধর্মসভা। রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। এদিনের সভার প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। সম্মানীয় অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া (গ্রামীণ) সাংগঠনিক জেলা সঙ্ঘচালক অরিন্দম সিংহরায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী রণজয় বিশ্বাস, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অমরেশ হাজরা, সঙ্ঘের হাওড়া (গ্রামীণ) সাংগঠনিক জেলা কার্যবাহ কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রভাকর পণ্ডিত। সমগ্র সভাটি সঞ্চালনার দায়িত্ব নির্বাহ করেন সঙ্ঘের হাওড়া (গ্রামীণ) সাংগঠনিক জেলা শারীরিক প্রমুখ রাজকুমার ঘোষ। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক'- এর মধ্য দিয়ে এদিনের সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। সভা শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের পর অনুষ্ঠিত হয় প্রতিমা নিরঞ্জন। ১৬ আগস্ট 'বেগড়ি অঞ্চল ভারতমাতা পূজন সমিতি'-র উদ্যোগে আয়োজিত হয় স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও রক্তদান শিবির। স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণ উপকৃত হন।

দমদমে ভারতমাতা পূজন ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

গত ১৪ আগস্ট পূর্বসিঁথি সনাতনী সঙ্ঘ (দমদম)-এর উদ্যোগে এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহযোগিতায় 'অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস' উদ্যাপন উপলক্ষ্যে উত্তর কলকাতায় দমদম পূর্বসিঁথি বাউল বেকারি মোড়ে ভক্তিপূর্ণভাবে ভারতমাতা পূজন ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। পূজা শেষে এলাকার সকল জনসাধারণের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। উপরোক্ত কর্মসূচিতে স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং একতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া ছিল এই পবিত্র অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। উপরোক্ত কর্মসূচিতে যোগদান করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বক্ষেত্র নৈতিক শিক্ষা প্রমুখ চন্দ্রনাথ দাস, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর উত্তর-পূর্ব ভাগ সঙ্ঘচালক রামকৃষ্ণ পাল, সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের সেবা প্রমুখ প্রমোদ প্রুস্তি, সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর পূর্ব বিভাগ প্রচারক ডাঃ পলাশ দলুই, সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর পূর্ব বিভাগের ব্যবস্থা প্রমুখ তপন সাহা, সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর উত্তর-পূর্ব ভাগের ব্যবস্থা প্রমুখ অভিষেক সরকার-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পূর্বসিঁথি সনাতনী সঙ্ঘ (দমদম) ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে ভারতমাতা পূজার আয়োজক ছিলেন প্রদীপ ঘোষ, প্রসূন চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ (বাপ্পা) দত্ত, সোমেন (রাজা) ঘোষ, তন্ময় (টুকাই) দত্ত, সুফল দাস প্রমুখ কার্যকর্তা।

ARICHA®

since 1942

www.arichaindia.com

5 BHK GRAND RESIDENCES

ECAUSE TRUE LUXURY MAKES ROOM FOR FAMILY

NOW MORE

4.46 CR* ONWARDS | FORESHORE ROAD

RERA.WB.GOV.IN | WBRERA/P/HOW/2025/003467 | ICICI Bank

98830 55000

PRIMARC
AADVIKA

জন্মাষ্টমী ও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ

অধ্যাপক ডঃ সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের ধর্ম ও ইতিহাসের প্রাণপুরুষ হলেন পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ভোজবংশীয় রাজা উগ্র সেনের পুত্র কংসের কারাগারে দেবকীর কোলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শাস্ত্রে দেখা যায়, এই আবির্ভাব ছিল বসুদেব-দেবকীর প্রতি শ্রীভগবানের তৃতীয়বারের প্রতিজ্ঞা পালন। প্রথমবার, পৃশ্নিপুত্র হিসেবে— তখন বসুদেব ছিলেন পৃশ্নি আর দেবকী ছিলেন সুতপা। দ্বিতীয়বার, বলি বধের জন্য বামন অবতার গ্রহণ করেছিলেন। তখন বসুদেব ছিলেন কশ্যপ আর দেবকী ছিলেন অদিতি।

গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— 'আমি জন্মহীন, অব্যয় আত্মা, ভূতগণের ঈশ্বর (শাসক, নিয়ন্তা, স্রষ্টা) হয়েও নিজ প্রকৃতিকে (অনির্বচনীয় মায়াশক্তিকে) আশ্রয় করে আত্মমায়ায় আবির্ভূত হই।' এছাড়া তিনি তাঁর আবির্ভাব নিয়ে আরও বলেছেন, তাঁর জন্ম সাধারণ মানুষের মতো নয়। মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মারা যায়, কিন্তু আমি জন্মরহিত হয়েও আবির্ভূত হই এবং অবিনশ্বর হয়েও অন্তর্ধান করে থাকি। আবির্ভূত হওয়া এবং অন্তর্হিত হওয়া— দু'টিই আমার অলৌকিক লীলা। অন্যান্য প্রাণী যেমন কর্মের ফলস্বরূপ জন্মগ্রহণ করে, ভগবান কিন্তু তেমনভাবে আবির্ভূত হন না। কর্মের ফলরূপে জন্ম হলে দুটি বিষয় থাকে— আয়ু ও সুখ বা দুঃখভোগ। ভগবানের এ দুটির কোনোটাই হয় না। কেননা, তিনি হলেন আয়ু, সুখ ও দুঃখের ঊর্ধ্বে।

গীতায় আছে— যখনই পৃথিবীতে অধর্মের প্রাদুর্ভাবে ভক্ত ও সাধারণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তখনই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এবং ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে ঈশ্বর 'অবতার' রূপ নিয়ে থাকেন। তখন তিনি ষড়গুণ, যথা— ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজ, জ্ঞান, শ্রী ও বৈরাগ্যসম্পন্ন 'পূর্ণাবতাররূপে' প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণই সেই পূর্ণাবতার।

গীতায় বলা হয়েছে— 'যে তথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (৪/১১) অর্থাৎ 'শ্রীভগবান সর্বভাবময়, তিনিই অদ্বিতীয় প্রাণপুরুষ। অতএব, যাঁরা যে ধর্ম মার্গই অনুসরণ করুক না কেন, সব পথের সাধকই তাঁকে পায়।' এই শ্লোকটিতে প্রকৃত হিন্দুধর্ম বা বেদান্ত ধর্মের বাস্তব রূপ প্রকটিত হয়েছে। 'যত মত তত পথ'— এটিই বেদান্ত ধর্মের মর্মবাণী।

শ্রীকৃষ্ণ যখন আর্বির্ভূত হন তখন পৃথিবীতে বহু ধর্মমত ও উপধর্মমত প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে, 'হে অর্জুন, আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করে আর জন্মগ্রহণ করেন না— তিনি আমাকেই পেয়ে থাকেন।' তাই তো তিনি দেবকী ও বসুদেবের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে কংসের কারাকক্ষে তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন পুত্ররূপে, কৃষ্ণ নামে— যা জন্মাষ্টমী তিথি নামে সুপরিচিত।

(লেখক বাংলা বিভাগ, হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের অধ্যাপক)

সনাতন শাস্ত্র মতে, বিশ্ব যখন ঘোর অন্ধকারে এবং মারাত্মক পাপ ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়েছিল তখন স্বয়ং পরমেশ্বর শ্রীশ্রীবিষ্ণুর মানবরূপী মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। উদ্দেশ্য— দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মরক্ষা। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দুর্বলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিহীন পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতেই শান্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর শিক্ষা হলো— অন্যায়কে পরাভূত করে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা।

ঈশ্বরতত্ত্বের মহান প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অবতারকৃষ্ণ ও পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, বেদে ঋষিকৃষ্ণ ও দেবতাকৃষ্ণ, মহাভারতে রাজর্ষি কৃষ্ণ, শাসক ও প্রজাপালক কৃষ্ণ, অত্যাচারী দমনে যোদ্ধা কৃষ্ণ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাণী সমগ্র বিশ্বকে হাজার হাজার বছর ধরে আলোড়িত করে চলেছে। মানবরূপে পৃথিবীতে আবির্ভাবের কারণ হিসেবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গীতায় বলেছেন,

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।" (জ্ঞানযোগ ৭-৮)

অর্থাৎ যখনই ভারতে ধর্মের গ্লানি হয়, অধার্মিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখনই সাধুদের পরিগ্রহণ ও ধর্মরক্ষার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হলো ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব। তিনি স্বয়ং ভগবান। তিনি সর্বকারণের কারণ। তিনি সৎ ও আনন্দস্বরূপ। তাঁর সমান কেউ নেই, তাঁর ঊর্ধ্বেও কেউ নেই। উপনিষদের ভাষায়— 'তিনি এক সর্বগঃ ও স্তবনীয় পুরুষোত্তম।'

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমী

ডঃ অনিল চন্দ্র দাস

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী শ্রীভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আনুমানিক ৫২৫৪তম আবির্ভাব তিথি। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা কৃষ্ণাব্দ নিয়ে নানা জনের নানা মত। একটি সমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, গত ২০০৪ সালে জ্যোতিষী অরুণ কুমার বনসাল কম্পিউটর সহায়তায় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব ৩২২৮ অব্দের ২৯ জুলাই। এই অভিমত সঠিক হলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সময় ১৬১ বছর।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মথুরায় মাতুল কংসের কারাগারে প্রকৃতির ভীমা-ভীষণা-ভয়ঙ্করী ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বারি-বিদ্যুৎবর্ষণ মুখর গভীর রজনীতে পুরোষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কংসকারাগারে আবির্ভূত হন। তন্মুহূর্তে অন্ধকার কারাকক্ষ আলোক-উজ্জ্বল হলো। কারারক্ষীগণ নিদ্রা গেল। এমন দুর্যোগপূর্ণ রাজনীতে পিতা বসুদেব সদ্য আবির্ভূত সন্তান বাসুদেবকে মস্তক ধারণ করে যমুনাপার নন্দালয়ে রেখে কারাগারে প্রত্যাগমন করেন। নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ পালিত হচ্ছেন। এই পুত্র কংসের হন্তা এই দৈববাণী ছিল। তজ্জন্য প্রাদুর্ভূত কৃষ্ণকে স্থানান্তরিত করা, মহাশীঘ্র করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ শ্রীমদ্ ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ম ও ৮ম শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান নিজ মুখে বলেছেন—

''যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমর্ধস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।।
৪।৭

হে ভারত! যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি, সাকাররূপে জনসমক্ষে প্রকট হই।

তিনি কীসের হেতু আবির্ভূত হন?

''পবিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।''
৪।৮

সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ হেতু এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন স্থানে শ্রীভগবানের স্বরূপতা সম্বন্ধে বলেছেন তিনিই জগতের মাতা-পিতা-বেদত্রয়—

''পিতাহহমস্য জগতো মাতা-ধাতা-পিতামহঃ।
বেদং পবিত্রমোহঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ।।''
৯।১৭

দশম অধ্যায় বিভূতি যোগে অনন্ত বিভূতির কিছু কথা নিজ মুখে বলেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি শ্লোকের খণ্ডাংশ উদ্ধৃত হলো--- 'বাদোহস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদ্যামৃতং দিবি'। বিশ্বজগৎ বিরাট পুরুষের মাত্র এক পাদ-একচতুর্থাংশ, অবশিষ্ট ত্রিপাদ অক্ষয়-অব্যয় দিব্যধাম। 'নান্যেহস্তি মম দিব্যাণাং বিভূতীনাং পরন্তপ।' ১০।৪০ আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নেই। 'বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোহস্মি'—১০।৩৭ বৃষ্ণিবংশীগণের মধ্যে আমি বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ)। 'গায়ত্রী ছন্দসামহম্—১০।৩৫ ছন্দসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রীছন্দ। 'বেদানাং সামবোহস্মি'--- বেদসমূহের আমি 'সাম' বেদ। 'আদিত্যানামহংবিষ্ণুঃ' —আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু। 'রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চামি'- একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর। 'বিষ্টভ্যামহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'—১০।৪২ সমস্ত জগৎ আমার একাংশ ধারণ করে আছি। 'নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।' ১০।৪০ হে পরন্তপ! আমার দিব্যবিভূতি সমূহের অন্ত নেই।

''গতির্ভতা প্রভুসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।' ৯।১৮

প্রাপ্তিযুক্ত পরম ধাম, ভর্তা, সকলের প্রভু, শুভাশুভ দ্রষ্টা, সকলের আশ্রয় স্থল, শরণ গ্রহণের যোগ্য, প্রত্যুপকারের আশা না রেখে হিতকারী, উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু, স্থিতির আধার, নিধান ও অবিনাশী কারণও আমি। দ্বাপর যুগাবতার কৃষ্ণের তিনটি লীলা—বৃন্দাবন-দ্বারকা-মধুরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এতেকলীলা সর্বোত্তম নরলীলা। তিনি দশাবতার বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্' শ্রীকষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এক অদ্বৈত কৃষ্ণের দ্বৈত প্রকাশ রাধা ও কৃষ্ণ। তিনি আবার অনন্ত। সুদর্শনধারী কৃষ্ণ তাঁর আবির্ভাবের ষষ্ঠদিনে পুতনা বধ করেন। তিন মাস বয়সে শকটাসুর নিধন, এক বছর বয়সে তৃণাবর্তকে বধ করেন। সপ্তমবর্ষে গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করেন। মেধ্রাসুর বধ করে তাঁর রক্ত দিয়ে হোলি খেলেন। মথুরা ও দ্বারকা লীলায়—কংস-জরাসন্ধ- নরক-বাণ-পৌণ্ড্রক-অসুরগণকে বধ করেন। বৃন্দাবন লীলায় তাঁর রাধা-কৃষ্ণলীলা।

শ্রীভগবানের দ্বিবিধ লীলা।—ঐশ্বর্যময়ী ও মাধুর্যময়ী। যে লীলায় শ্রীভগবান 'ঐশ্বর্যময়ী' ও 'মাধুর্যময়ী'। যে লীলায় শ্রীভগবান কোথাও আবির্ভাব লাভ করেন না, কিংবা কারও সঙ্গে পিতা-মা প্রভৃতি সম্বন্ধ রাখেন না কেবলমাত্র আপন অচিন্ত্য ঐশ্বর্যের প্রভাবে ভক্ত মনোরথ পরিপূর্ণ করবার জন্য অবতীর্ণ হন, শ্রীভগবানের সেই লীলা ঐশ্বর্যময়ী। আর যে লীলায় তিনি অবতীর্ণ হয়ে পিতা-মাতা প্রভৃতি সম্বন্ধের অনুগত থেকে ভক্ত মনোরথ পূর্ণ করেন সেই লীলা মাধুর্যময়ী। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন—'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্ত মম ভূতমহেশ্বরম্'— গীতা ৯।১১।— মূঢ় মানুষগণ আমার পরম ভাব না জেনে আমাকে অবজ্ঞা করে। যদিও তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'— আমি এক অদ্বিতীয় তথাপি 'অকোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি'—এক হয়েও তাঁর বহু প্রকাশ। ◻

মদনমোহন ও কোচবিহারের রাসমেলা

অশোক কুমার ঠাকুর

কোচবিহারের রাসমেলা বঙ্গের শতাব্দী প্রাচীন মেলাগুলোর অন্যতম। উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড়ো মেলা। এই মেলার সূচনাকাল মেলার শুভারম্ভ দিবস হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। তৎকালীন কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ সন্ধ্যাবেলা নতুন গৃহে প্রবেশ উপলক্ষ্যে মদনমোহন দেবের রাসযাত্রার সূচনা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, সেই সময় কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান কোচবিহার শহরের পনেরো-ষোলো কিলোমিটার উত্তরে ভেটাগুড়ি অঞ্চলে।

বর্তমান কোচবিহারের সুবিশাল দৃষ্টিনন্দন রাজপ্রাসাদটি নির্মিত হয় ১৮৮৭ সালে। খরচ হয়েছিল ৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ২০৩ টাকা। নতুন রাজপ্রাসাদ ও শহরের আধুনিকীকরণের পর কিছু কিছু মন্দিরের স্থানান্তরকরণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী ১৮৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব নির্ধারিত বর্তমান স্থানে মদনমোহন মন্দির নির্মিত হয়। মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হলে কোচবিহারের রাসমেলা স্থানান্তরিত হয়ে মদনমোহন বাড়ি সংলগ্ন বৈরাগী দিঘির পাড় চলে আসে। পরবর্তীতে রাসমেলার কলেবর বৃদ্ধি পায় এবং প্যারেড গ্রাউন্ড (বর্তমান রাসমেলা ময়দান) পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

তবে কবে থেকে রাসমেলা ময়দান পর্যন্ত মেলা প্রসারিত হয় তার সঠিক সন তারিখ বলা মুশকিল। তবে রাসমেলার সূচনা যখন যেখানেই হোক না কেন, শুরু থেকেই এই মেলা কোচ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণে লালিত পালিত বর্ধিত ও পল্লবিত হয়েছে।

এই রাসমেলার মূল আকর্ষণ রাসচক্র। বংশপরম্পরায় মুসলমান কারিগর এই রাসচক্র তৈরি করেন। বৌদ্ধ ধর্মচক্রের আদলে বাঁশের তৈরি প্রায় ৩০-৪০ ফুট উঁচু এবং ১০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট চোঙাকৃতি কাঠামোর উপর কাগজের সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং দেব-দেবীর নকশা সমন্বিত এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। এই রাসচক্র ভূভারতে একমেবাদ্বিতীয়ম্। কবে কীভাবে এই রাসচক্রের সৃষ্টি হয়েছিল সেটাও আজ বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়।

রাজ আমলে রাসমেলার সূচনা হতো মহারাজাদের হাত দিয়ে। মহারাজা শুদ্ধ বস্ত্রে মদনমোহনের পূজা দিয়ে রাসচক্র ঘুরিয়ে রাসমেলার উদ্বোধন করতেন। পরবর্তীতে কোচবিহার রাজ্য যখন ভারতভুক্ত হয় তখনো এই ধারা বজায় ছিল। সত্তরের দশকের প্রথমার্ধেও রাজবংশের কোনো সদস্যের হাতেই এই রাসচক্র ঘুরিয়ে রাসমেলার উদ্বোধন হতো। বর্তমানে রাজবংশের সরাসরি বংশধর না থাকায় কোচবিহারের জেলা শাসক সমস্ত রীতি মেনে মদনমোহনের পূজা দিয়ে রাসচক্র ঘুরিয়ে রাসমেলার উদ্বোধন করেন।

বর্তমান মদনমোহন বাড়ি মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের উপস্থিতিতে শাস্ত্র মতে উদ্বোধন করা হয় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে। কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত মদনমোহন মন্দিরটি একতলাবিশিষ্ট। মন্দিরের আয়তন ৬ বিঘার সামান্য বেশি। মন্দিরের প্রবেশ পথে আছে সুদৃশ্য তোরণদ্বার।

এই তোরণদ্বারের উপর সঙ্গীত কক্ষে এক সময় উস্তাদ বিসমিল্লা খানের আত্মীয়রা বংশপরম্পরায় সন্ধ্যাবেলায় সানাই বাজাতেন। এখন রেকর্ড বাজানো হয়। মদনমোহন মন্দিরে শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিগ্রহ আছে। যেমন আনন্দময়ী কালী, জয়তারা, মা ভবানী। মন্দিরের সামনে ১১ বিঘা ৬ কাঠা আয়তনের বৈরাগী দিঘি যা মদনমোহন বাড়িরই সম্পত্তি।

কোচবিহার রাসমেলার সঙ্গে শ্রীশ্রী মদনমোহন (শ্রীকৃষ্ণ) ঠাকুরের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কারণ মদনমোহনের রাসলীলা বা রাসপূর্ণিমা তিথিকে কেন্দ্র করেই উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ মেলাটির জন্ম।

আজ শুধু দেশ নয় বিদেশের বণিকরাও এই মেলায় তাদের পশরা সাজিয়ে বসেন। কোচবিহারবাসী এই মেলায় বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করেন, বিনোদনে ও নিত্য প্রয়োজনীয় দুর্লভ সামগ্রী ক্রয় করেন।

কৈলাসের নীরব প্রহরী

নন্দীর অবিচল ধৈর্য ও সহনশীলতার অমর কাহিনি

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী

হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখরের ওপরে, মেঘেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত কৈলাস পর্বত। সেখানে বাস করেন দেবাদিদেব মহাদেব এবং দেবী পার্বতী। কৈলাসের প্রবেশদ্বারে, অনন্তকাল ধরে এক মহামহিম প্রহরী নীরবে বসে থাকেন, তিনি নন্দী, মহাদেবের প্রিয় বাহন, অনুগত সেবক এবং চিরন্তন ভক্ত। অসংখ্য মানুষ নন্দীকে কেবল একটি বলবান বৃষরূপেই চেনে। কিন্তু দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্বরা জানতেন, নন্দীর প্রকৃত শক্তি তাঁর বিশাল দেহে নয়, বরং তাঁর অপরিসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং অবিচল বিশ্বাসে নিহিত। এই কাহিনি সেই সময়ের যখন পৃথিবীর মানুষ ক্রমশ অধৈর্য, ক্রুদ্ধ ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছিল। ঋষিরা উদ্বিগ্ন হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মানুষকে শক্তির নয়, ধৈর্যের শিক্ষা দিতে হবে। আর এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য নন্দীর চেয়ে যোগ্য আর কে আছে?

নন্দী বিনীতভাবে মাথা নত করে বললেন, 'প্রভু, আপনার আদেশ প্রতিপালনই আমার ধর্ম।'

পরদিন তিনি মানবলোকে যাত্রা করলেন।

প্রথম পরীক্ষা : অপমানের আগুন

নন্দী এক প্রত্যন্ত গ্রামের কাছে এসে দেখলেন, সেখানে বহু মানুষ খরা ও দুর্ভিক্ষ কষ্ট পাচ্ছে। তিনি নিজের ঐশ্বরিক শক্তি ব্যবহার করে সাধারণ এক সাদা বৃষের রূপ ধারণ করলেন, যাতে মানুষের প্রকৃত স্বভাবকে কাছ থেকে জানতে পারেন। একদিন তিনি গ্রামের বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কয়েকজন উদ্ধত যুবক তাঁকে দেখে হাসাহাসি শুরু করল, একজন বলল, 'দেখো, কী অলস একটা বলদ!'

আরেকজন তাঁর গায়ে পাথর ছুড়ে মারল। কেউ তাঁর লেজ টানল, কেউ তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। নন্দী নীরবে সব সহ্য করলেন।

তাঁর চোখে ক্রোধের কোনো চিহ্ন ছিল না। কারণ তিনি জানতেন, অন্যের আচরণ সবসময় নিজের চরিত্রের পরিচয় দেয় না; বরং নিজের প্রতিক্রিয়াই প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় বহন করে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃদ্ধ কৃষক এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে যুবকদের বললেন, 'যে শক্তিশালী হয়েও আঘাত করে না, তার শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ।' নন্দী নীরবে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসলেন।

দ্বিতীয় পরীক্ষা : ক্ষুধার মধ্যেও করুণা

কয়েকদিন পরে গ্রামের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে

গেল। খাদ্যের অভাবে মানুষ পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে লাগল। একদিন এক ক্ষুধার্ত বালক মাঠে অচেতন হয়ে পড়ে গেল। নন্দী নিজের জন্য সঞ্চিত অল্প খাদ্যটুকু সেই শিশুর সামনে রেখে দিলেন। সেই খাবার খেয়ে শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু বুঝতেই পারল না কে তাকে রক্ষা করেছে। রাতের অন্ধকারে গ্রামের কয়েকজন মানুষ নন্দীর জন্য রাখা শুকনো খড়ও নিয়ে চলে গেল। তবু নন্দী তাদের প্রতি কোনো রাগ অনুভব করলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'যে মানুষ অভাবে থাকে, তার ভুলের বিচার করার আগে তার কষ্টকে বোঝা উচিত।'

তৃতীয় পরীক্ষা : ক্রোধের মুখে নীরবতা

একদিন গ্রামের দুই পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে ভয়াবহ কলহ শুরু হলো। ক্রোধ এতটাই বেড়ে গেল যে, তারা অস্ত্র হাতে একে অপরের দিকে ধেয়ে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে নন্দী তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে দুই পক্ষের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরা তাঁকে সরানোর চেষ্টা করল। কেউ পাথর ছুড়ল, কেউ লাঠি দিয়ে আঘাত করল। কিন্তু নন্দী এক পাও সরলেন না। তাঁর চোখে ছিল না কোনো প্রতিশোধের আগুন, ছিল শুধুই গভীর শান্তি। ক্রমে দুই পরিবারই ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

একটি ছোটো মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না? এই নির্বাক প্রাণীটি আমাদের জন্য কীভাবে আঘাত সহ্য করছে!' চারদিকে নীরবতা নেমে এল। লোকেরা লজ্জায় মাথা নীচু করল। সেদিন আর কোনো সংঘাত হলো না। বরং সবাই একে একে নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেল।

চতুর্থ পরীক্ষা : ঝড়ের রাত্রি

কয়েক মাস পরে এক ভয়ঙ্কর ঝড়ে গ্রামের বহু শিশু ও বৃদ্ধ ভেঙে পড়া বাড়ির ধ্বংস্তূপের মধ্যে আটকা পড়ল।

ফঃ ৫

সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতে, নন্দী নিজের জীবন বিপন্ন করে একের পর এক মানুষকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে লাগলেন। তাঁর শরীর রক্তাক্ত হলো, কিন্তু তিনি থমলেন না। ভোর হওয়ার পর দেখা গেল, গ্রামের সবাই নিরাপদে আছে, কিন্তু নন্দী পাহাড়ের নীচে ক্লান্ত ও আহত অবস্থায় শুয়ে আছেন। সেই মুহূর্তে সমগ্র গ্রামবাসী তাঁর চারপাশে জড়ো হলো। যারা একদিন তাঁকে অপমান করেছিল, তারাই আজ অশ্রুসজল চোখে তাঁর সেবা করতে লাগল। ঠিক তখনই আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল। দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবী পার্বতী আবির্ভূত হলেন। সবাই বিস্ময়ে নতজানু হয়ে পড়ল।

মহাদেব বললেন, 'এই নন্দী তোমাদের শত্রু ছিল না, বিচারকও ছিল না। সে এসেছিল তোমাদের শেখাতে যে প্রকৃত শক্তি ক্রোধে নয়, সহিষ্ণুতায়; প্রতিশোধে
নয়, ক্ষমায়; অহংকারে নয়, সেবায় নিহিত।'

গ্রামবাসীরা অশ্রুসিক্ত চোখে নন্দীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। নন্দী কেবল মৃদু হাসলেন। কারণ তিনি জানতেন, ক্ষমা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তার সঙ্গে কোনো অহংকার যুক্ত থাকে না। কৈলাসে ফিরে আসার সময় মহাদেব নন্দীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কখনো ক্রুদ্ধ হওনি?'

নন্দী বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, 'প্রভু ক্রোধ অনেক সময় শক্তির পরিচয় দেয়, কিন্তু ধৈর্য সবসময় প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়।'

মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করলেন, 'যতদিন পৃথিবীতে ধৈর্য, সহনশীলতা ও কর্তব্যবোধের কথা স্মরণ করা হবে, ততদিন তোমার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে।'

আজও ভারতবর্ষের অসংখ্য শিবমন্দিরে ভক্তরা নন্দীর কানে নিজেদের মনের কথা বলেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন, নন্দী কেবল মহাদেবের বাহন নন; তিনি ধৈর্য, ভক্তি, সহিষ্ণুতা এবং নীরব শক্তির চিরন্তন প্রতীক।

নৈতিক শিক্ষা ও মূল বার্তা

নন্দীর কাহিনি আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও বাস্তব জীবনভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করে,—

১. ধৈর্য একটি সক্রিয় শক্তি : আধুনিক মনোবিজ্ঞান গবেষণায় দেখা গেছে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্য দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য, মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান।

২. সহনশীলতা দুর্বলতা নয় : সামাজিক ও আচরণগত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শান্ত থাকতে পারেন, তাঁরা সংকট মোকাবিলায় অধিক কার্যকর হন এবং সমাজে ইতিবাচক নেতৃত্ব প্রদান করেন।

৩. ক্ষমা ও সহমর্মিতা সমাজকে সুস্থ করে : সমসাময়িক ইতিবাচক মনোবিজ্ঞান ও সংঘাত সমাধান গবেষণায় দেখা যায় যে, ক্ষমাশীলতা ও সহমর্মিতা ব্যক্তিগত মানসিক ইতিবাচক মনোবিজ্ঞান ও সংঘাত সমাধান গবেষণায় দেখা যায় যে, ক্ষমাশীলতা ও সহমর্মিতা ব্যক্তিগত মানসিক চাপ কমায় এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।

৪. প্রকৃত শক্তি হলো আত্মসংযম : নন্দীর জীবন আমাদের শেখায় যে, শারীরিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়ো শক্তি হলো নিজের আবেগ, ক্রোধ ও অহংকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।

অতএব, নন্দীর কাহিনির মূল শিক্ষা হলো, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, করুণা ও কর্তব্যনিষ্ঠাই মানুষের প্রকৃত মহত্ত্বের ভিত্তি। ☐

মাওবাদী ও দিমাগি নকশালদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন চাই

আনন্দ মোহন দাস

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বেআইনি জেনারেল বডির মিটিংকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রভক্ত ছাত্র সংগঠন বিদ্যার্থী পরিষদ এবং বাম-অতিবাম ছাত্র সংগঠনের মধ্যে কিছু অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেছে। যা নিয়ে বাম, মাওবাদী ও দিমাগি নকশালরা দেশব্যাপী মিথ্যা ন্যারেটিভ তৈরি করে গেল গেল রব তুলেছে। এমনকী একটি জাতীয়তা বিরোধী সংবাদপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে 'গেরুয়া গুন্ডামি ও সন্ত্রাস' আখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক রুটি সেঁকতে ন্যারেটিভ তৈরি করে ফেলেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে ত্যাগ, সমর্পণ ও শ্রদ্ধার প্রতীক গেরুয়াকে অপমান করা হয়েছে। গেরুয়ার সঙ্গে হিন্দু ও সাধুসন্ত সমাজ সম্পৃক্ত। তাই হিন্দু সমাজ ও সন্ত সমাজ আজ অপমানিত। ভারতের জাতীয় পতাকার শীর্ষে রয়েছে গৈরিক বর্ণের স্থান। 'গেরুয়া সন্ত্রাস'-এর ন্যারেটিভ প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করেছে একশ্রেণীর বিকৃতমনস্ক সংবাদমাধ্যম।

বাম, অতিবামরা সংবাদপত্রে, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যাচার করে নিজেদেরকে মহান বানাবার এবং নিজেদেরকে সবচেয়ে শিক্ষিত প্রমাণ করার মরিয়া চেষ্টা করে চলেছে। কারণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী হলেই নাকি অনৈতিক কাজের অধিকার জন্মায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যপূর্ণ ও গৌরবময় ইতিহাস থাকলেও বেশকিছু বাম,অতি বাম অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের মৌরসিপাট্টা ও অপসংস্কৃতির আখড়া বানিয়েছে। বাম অতিবামের প্রেরণায় মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনকে রাষ্ট্র বিরোধিতার আঁতুড়ঘর করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও হোস্টেলের সরকারি সুবিধা ভোগ করে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়করভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের অনুপ্রবেশে চুপি সেধেছে! বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে এই সমস্ত বুড়ো ভামগুলি কালচারাল মার্ক্সিজম্ ও উওকিজম্-এর নামে মদ, গাঁজা-সহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সেবনের আখড়া বানিয়ে ফেলেছে। এমনকী হোস্টেলের আশপাশে মদের বোতলের সঙ্গে ব্যবহৃত জন্মনিরোধক পাওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। এমনকী এরা কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও হোস্টেলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছাত্র- ছাত্রীদের গোপনীয়তা ও মুক্ত চিন্তনের দোহাই দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সিসিটিভি লাগাতে দেয় না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রাগের নেশায় আচ্ছন্ন করে অসামাজিক কাজে বাধ্য করে। পাস-আউট দাদারা তথা বুড়ো ভামরা মগজ ধোলাই করে হোস্টেলে ছেলে-মেয়েদের ধ্বংসাত্মক মাওবাদী চিন্তাধারার জালে ফাঁসিয়ে দেয়। বহু নিরীহ ও সাধারণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্ল্যাকমেইলিং এবং ভয়ংকর র‍্যাগিং করে থাকে। সিনিয়র দাদাদের অনৈতিক কাজে সাড়া না দিলে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়। নদীয়ার সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান মেধাবী ছাত্র স্বপ্ননীল কুণ্ডুকে কণ্ঠে তুলসী মালা পরার অপরাধে নিরন্তর র‍্যাগিং করে তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া হয়। অধ্যাপক মহম্মদ নিহারকেও তিলে তিলে হত্যা করা হয়। তাই দৃঢ়চেতা, আপোশহীন, আদ্যন্ত জাতীয়তাবাদী উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনকেও এদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অনৈতিক কাজে প্রতিবাদ করায়, 'হোক কলরব' আন্দোলনের নামে শিক্ষাঙ্গনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ অভিজিৎ চক্রবর্তীকেও পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। বাম, অতিবাম ছাত্র সংগঠন ও অধ্যাপকরা একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে এই শিক্ষা পরিসরকে গুন্ডামির আখড়া বানিয়ে রেখেছে। এমন পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যে এদের সঙ্গে আপোশ না করলে এখানে অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন।

এবার একটি শুভ লক্ষণ যে এরা রাষ্ট্রভক্ত বিদ্যার্থী পরিষদের পালটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এদের ফাঁদে পা না দিলে নানা ভাবে নিরন্তর ছাত্র-ছাত্রীদের হেনস্থা করা হয়। হোস্টেল খালি করে মিছিলে শামিল না হলে একঘরে করে রাখা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অনৈতিক কাজে বাধ্য করা এবং হুমকি দেওয়া— এটাই মাওবাদী, নকশালপন্থী ও বাম ছাত্র সংগঠনগুলির গোপন কীর্তি। বাবা-মায়েরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এই

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করেন। কিন্তু মেধার নামে অপসংস্কৃতির শিকার হয়ে দেশবিরোধী হয়ে ওঠে। এখানে রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়। দেশকে টুকরো করার মন্ত্র শেখানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে মদ, গাঁজা খাওয়ার আজাদি চাওয়া, হেরোইন খাওয়ার আজাদি চাওয়া, কাশ্মীর-মণিপুর-প্যালেস্তাইনের আজাদি চাওয়া, ৩৭০ ধারা ফেরাতে চাওয়া, দেশদ্রোহী উমর খালিদের জেল থেকে মুক্তি চাওয়া এবং 'আফজল হাম সরমিন্দা হ্যায়, তেরে কাতিল আভি জিন্দা হ্যায়', 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' জাতীয় স্লোগানগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো হয়। এরা পড়াশোনার নামে ভারতের স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করে। এরা হিন্দু দেবদেবীর নগ্ন মূর্তি এঁকে অসম্মান করে। হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্মকে সবরকমভাবে অসম্মান করে। বন্দে মাতরম্, ভারতমাতার জয়ধ্বনির বিরোধিতা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দেওয়ালে রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান লেখে, বহু নিরীহ মানুষের হত্যাকারী, মাওবাদী উগ্রপন্থী কিষেণজীকে স্যালুট জানায়। মাওবাদীদের দ্বারা দান্তেওয়াড়াতে ২৫০ জন সিআরপিএফ, পুলিশকর্মী ও সাধারণ মানুষের হত্যা হলে এরা উল্লসিত হয়ে মিছিল করে। এখানে ভারতীয় বিপ্লবী ও মনীষীদের চেয়ে বিদেশি মার্ক্স, লেনিন ও চে গুয়েভারাকে নিয়ে মাতামাতি করা হয়। এরাই দেশবরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কুইসলিং, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বুর্জোয়া কবি, স্বামী বিবেকানন্দকে পথভ্রষ্ট ভিখারি সাধু এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মৃগীরোগীর সঙ্গে তুলনা করে। এরা ভারতীয় মনীষীদের অপমান করে, বিদেশি মার্ক্স, লেনিন, স্তালিন ও চে গুয়েভারার গুণকীর্তন করে। ভারতে এইসব বিদেশিদের কোনোরকম অবদান নেই। এরা গাজা, প্যালেস্তাইনে জেহাদি সন্ত্রাস দমনে ইজরায়েলের সামরিক পদক্ষেপের প্রতিবাদে মিছিল করে কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুদের অত্যাচারে মুখে কুলুপ আঁটে। এই হলো নকশাল, মাওবাদী বাম ও অতিবাম ছাত্র সংগঠনগুলির দ্বিচারিতা। এখানে বাম, অতিবাম অধ্যাপকরাও পড়াশোনা ছেড়ে প্রতিনিয়ত ছাত্রদের মগজ ধোলাই করে এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপে উসকানি দেয়।

ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু নিন্দাজনক ও হিংসাশ্রয়ী ঘটনাও ঘটিয়েছে। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, রাজ্যপাল ও উপাচার্যকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হেনস্থা ও অপমানিত হতে হয়েছে। পূর্বতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও এরাজ্যের পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও হেনস্তা হতে হয়েছে। অনেক রাজ্যপালও (পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অপমানিত হয়েছেন। এই কায়দায় এখানে ছাত্র রাজনীতির আড়ালে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য বেশ কিছু বাম, অতি বাম, মাওবাদী ও 'দিমাগি নকশাল' অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মচারী পর্দার আড়ালে এদের প্ররোচিত করে থাকে। এখানে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় না, জাতীয় সঙ্গীত ও পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত করা যায় না; এই শিক্ষাঙ্গনে সরস্বতীপূজা করলে বাধা দেওয়া হয়, কিন্তু এরাই জাঁকজমক সহকারে ইফতার পার্টির আয়োজন করে। এরা বাক্‌স্বাধীনতার নামে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কটূক্তি ও অশ্লীল মন্তব্য করে থাকে।

ছাত্র আন্দোলনের নামে কখনো হোক কলরব, গণচুম্বন ও অন্তর্বাস পরে প্রকাশ্যে মিছিল করে তারা। এই ধরনের আচরণ কি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীসুলভ পরিচায়ক? স্বামী বিবেকানন্দ কি এই ধরনের যুবসমাজ চেয়েছিলেন? এ বিষয়ে সকলের চিন্তন ও মন্থনের সময় এসেছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো— এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার দোহাই দিয়ে বেশ কিছু দিমাগি নকশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নেয় এবং বহু বছর গবেষণার নামে তাদের পার্টির কাজ করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মগজ ধোলাই করে। পর্দার আড়ালে রয়েছে বেশ কিছু বাম, অতিবাম অধ্যাপক, যারা সুপরিকল্পিতভাবে এদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সুযোগ করে দেয়। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় পিএইচডি স্ক্যাম নিয়ে কথোপকথনের অভিযোগ উঠেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিনের অভিযোগ দলীয় আনুগত্য থাকলে অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের পিএইচডি করার সুযোগ দেওয়া হয়। অন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা থাকলেও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

এর মাধ্যমেই বাম,অতিবামদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়, যারা পরবর্তীকালে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আশ্রয় নেয়। এমনকী পিএইচডি-র গবেষণার বিষয়ও তাদের দ্বারা নির্ধারিত হয়, নতুবা গবেষণা করতে বাধা দেওয়া হয়। পছন্দের বিষয় না থাকলে গাইডরা কাজ করতে চান না। কারণ বহুদিন ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের একটি ইকোসিস্টেম ভীষণভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে এই চক্রের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত জরুরি। তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম ও অতিবামদের মুখোশ খুলে যাবে। ইদানীং এই বাম, অতিবাম নেতারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থনে বলতে গিয়ে নিজেদের দলের পুরনো নেতাদের বড়ো স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে দাবি করতে আরম্ভ করেছে। সেজন্য কমিউনিস্টদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' শীর্ষক পুস্তকের একটি অংশ উল্লেখ করতে চাই। তিনি লিখেছেন--- ''ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ গভর্নমেন্টের এজেন্টের কাজ করিয়াছে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারত উদ্ধার অভিযানের নিন্দা প্রচার করিয়াছে। ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। একটা রাজনৈতিক দলের এরূপ স্বদেশদ্রোহিতা ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।''

এই দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের মুখোশ খুলে তাদের সমূলে উৎপাটন করতে রাজ্য তথা দেশজুড়ে ব্যাপক জনজাগরণের প্রয়োজন রয়েছে। □

বিকশিত ভারতের স্বার্থে দেশের যুবসমাজকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে

অজয় ভট্টাচার্য

ভারত একটি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ। যার ফলে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বছর বছর বাড়ছে। শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন রাস্তা, রেল, বিমানবন্দর, বন্দর ও অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। প্রযুক্তি, উৎপাদন ও ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসার ঘটছে। মানুষের গড় আয় ও ভোগের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সমাজের প্রত্যেক মানুষ সমানভাবে এই উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছায় না। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির বৈপরীত্য হলো, এটি যতটা মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার ক্ষমতা রাখে, তার চেয়েও বেশি নতুন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ অর্থনীতি যত এগোয়, মানুষের চাহিদা, প্রত্যাশা ও জীবনমানের আকাঙ্ক্ষাও তত বাড়ে। কিন্তু সেই অনুযায়ী প্রত্যাশা পূরণ হয় না। ফলে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের তরুণ জনসংখ্যার আকার মানব ইতিহাসে এযাবৎকালের মধ্যে সর্ববৃহৎ। বিশেষ করে ১৫ থেকে ২৯ বছর বা ১৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সি মানুষের সংখ্যা বিবেচনা করলে, বর্তমানে ভারতের তরুণ জনগোষ্ঠী বিশ্বের যেকোনো দেশের অতীত বা বর্তমানের তুলনায় সর্ববৃহৎ। গোটা বিশ্বে জন্মহার কমতে থাকায়, এটি আর কখনোই অন্য কোনো দেশের সঙ্গে মিলবে না বা কেউ এটিকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। ভারতে ৩০ বছরের কম বয়সি মানুষের সংখ্যা ৭৫.৩ কোটি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্মিলিত জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। এর মধ্যে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের সংখ্যা ৩৭.১ কোটি। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, দ্রুত প্রসারমান পরিকাঠামো এবং এই বিপুল যুবশক্তির সমন্বয় আগামী দশকগুলিতে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত শক্তিতে পরিণত করতে পারতো, কিন্তু ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির বৈপরীত্যের কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

কৃষি উৎপাদন থেকে আয় কমে গেছে, যা তরুণদের গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। শহরগুলোকে কেন্দ্র করে আমরা এমন একটি সেবা-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে আমরা ক্রমশ ধাবিত হচ্ছি, যে অর্থনীতিতে সুযোগগুলো কেবলমাত্র শহরেই সৃষ্টি হয়। ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় নথিভুক্তীকরণ বা ভর্তির হার ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৫ কোটিতে পৌঁছেছে, যা একটি সর্বভারতীয় নগর অর্থনীতির দিকে আরও বেশি সংখ্যক যুবসমাজকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এই অর্থনীতি তাদের কর্মসংস্থানের জন্য যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করতে পারছে না। প্রতি বছর এক কোটি ২০ লক্ষ ভারতীয় তরুণ চাকরির বাজারে প্রবেশ করছে। অপরপক্ষে সরকার-পরিচালিত কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে চলেছে। যেখানে সরকার-পরিচালিত কর্মসংস্থানই নবীন প্রজন্মের মূল ভরসার জায়গা। ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন খাত স্থবির হয়ে পড়েছে। এক দশকের ধারবাহিক ধাক্কা সামলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো এখনও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

ভারতে মাত্র ৩.৭৩ শতাংশ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ রয়েছে। যে সকল শিল্প নিয়োগের প্রধান ভরসা তারা মাত্র ৪২.৬ শতাংশ স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েটকে নিয়োগযোগ্য বলে গণ্য করছে! এর ফলে কেবল বেকারত্ব তৈরি হচ্ছে এমনটা নয়, এমন একটি হতাশ যুবসমাজের স্থায়ী দল তৈরি হচ্ছে, যারা স্বাবলম্বী হয়ে সমৃদ্ধি অর্জনের কোনো পথ দেখতে পাচ্ছে না। তাই ভারতকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত শক্তিতে পরিণত করতে হলে দেশের এই বিশাল যুবশক্তিকে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। এই সম্ভাবনায় তরুণদের দক্ষতা, শিক্ষা ও উদ্ভাবনের আলোয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিক্ষান্তে তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং শিল্প ও পরিষেবা খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্মর্তব্য যে, দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে, স্থিতিশীলতার স্বার্থে, পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং বৈশ্বিক পরিসরে ভারতের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে কেন্দ্রে বিজেপিকেই প্রয়োজন। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার সংকল্প বিজেপিরই। বিকশিত ভারতের স্বার্থে যুবসমাজকে দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতেই হবে। □

স্বল্প খরচের দেশীয় প্রযুক্তিতে গ্রামীণ ফেক্যাল স্লাজ ব্যবস্থাপনায় নয়া দিশা দেখাচ্ছে আইআইটি খড়্গপুর

ডঃ পার্থ সারথি ঘোষাল ও তাঁর সহযোগী গবেষকের পেটেন্টেড প্রযুক্তিতে বাঁচছে এক-পঞ্চমাংশ খরচ ও এক দশমাংশ জমি; সেপটিক বর্জ্য রূপ নিচ্ছে নিরাপদ চাষের সার ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেকসই নিকাশি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে অত্যন্ত সাশ্রয়ী, কম জায়গা নির্ভর এবং পেটেন্টেড 'ফেক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এফএসটিপি) প্রযুক্তি উদ্ভাবন করলেন আইআইটি খড়্গপুরের 'স্কুল অব ওয়াটার রিসোর্সেস'-এর গবেষকরা। অধ্যাপক ডঃ পার্থ সারথি ঘোষাল এবং তাঁর গবেষক ছাত্রী শাশ্বতা সাহুর যৌথ নেতৃত্বে উদ্ভাবিত এই দেশীয় প্রযুক্তি— 'এনহ্যান্সড ডাইজেশন মাল্টি-স্টেজ বায়োরিঅ্যাক্টর' (EDMSB) এবং 'বায়ো-ডাইজেস্টার এইডেড কনস্ট্রাকটেড ওয়েটল্যান্ড' (BAC-FSTP)— পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকার ফেক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্টে (FSM) এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে চলেছে।

ভূগর্ভস্থ স্যুয়ারেজ লাইনহীন জনপদ এবং ছোটো পুরসভাগুলিতে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও পিট-ল্যাট্রিন থেকে নির্গত বর্জ্য সরাসরি শোধন ছাড়া নদী-নালা বা খালে ফেলার ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণ ঘটে। এই সংকট মোকাবিলায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)'-এর নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন (P & RD) দপ্তর আইআইটি খড়্গপুরের বিশেষজ্ঞ পরামর্শে রাজ্যজুড়ে একটি সুদূরপ্রসারী বিকেন্দ্রীভূত স্যানিটেশন রূপরেখা গ্রহণ করেছে।

ভারতে প্রচলিত পয়ঃবর্জ্য শোধনাগারগুলি অতিরিক্ত নির্মাণ খরচ, বিশাল পরিমাণ জমির চাহিদা এবং জটিল মেকানিক্যাল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে গ্রামাঞ্চলে প্রায়শই অচল হয়ে পড়ে। আইআইটি খড়্গপুরের তৈরি এই মডুলার ও বিকেন্দ্রীভূত মডেলগুলি আঞ্চলিক আবহাওয়া, বিদ্যুতের প্রাপ্যতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং স্বল্প জমির পরিমাণের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানানসই। এর মধ্যে EDMSB প্রযুক্তিটি একাধিক ধাপে অ্যানারোবিক ডাইজেশনের মাধ্যমে দ্রুত কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ নামিয়ে আনে এবং কার্যকরভাবে শোধন নিশ্চিত করে। অন্যদিকে BAC-FSTP প্রযুক্তিটি বায়ো-ডাইজেস্টারের কার্যক্ষমতার সঙ্গে প্রাকৃতিক কনস্ট্রাকটেড ওয়েটল্যান্ডকে সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ ছাড়াই অ্যারোবিক ও অ্যানারোবিক উভয় পদ্ধতিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে স্লাজ শোধন করে।

সংক্ষিপ্ত পরিকাঠামো, ন্যূনতম বিদ্যুৎ ও জমির প্রয়োজনীয়তা, মডুলার সুবিধা এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারের সুযোগ এই প্রযুক্তির মূল শক্তি। ফিল্ড পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, প্রচলিত প্ল্যান্টের তুলনায় ডঃ ঘোষালের পেটেন্টেড প্রযুক্তিতে নির্মাণ খরচ কমে প্রায় এক পঞ্চমাংশে (১/৫) এবং জমির প্রয়োজন কমে প্রায় এক-দশমাংশ (১/১০)। সরকারি পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই প্ল্যান্টগুলি থেকে নির্গত শোধিত তরল দূষণ নিয়ন্ত্রণের সমস্ত সরকারি মানদণ্ডের চেয়েও বহু গুণ বেশি বিশুদ্ধ।

শুধুমাত্র পরিশোধিত জলই নয়, মানুষের সরাসরি সংস্পর্শ প্রক্রিয়াজাত হয়ে ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়ামুক্ত, পুষ্টিকর জৈব সারে পরিণত হয়। এই নিরাপদ কম্পোস্ট স্থানীয় কৃষকরা চাষের জমিতে রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। অন্যদিকে পরিশোধিত স্বচ্ছ জল চাষের জমি, রাস্তার ধারের বাগান পরিচর্যা, উদ্যানপালন এবং ধোয়ামোছার কাজে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য— যা একটি নিখুঁত সার্কুলার ইকোনমি বা বৃত্তকার অর্থনীতির পরিবেশ গড়ে তুলছে।

আইআইটি খড়্গপুর এবং রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এই ফলপ্রসূ সমন্বয় দ্রুত বাস্তব রূপ পেয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জন্য ৫০টিরও বেশি FSTP প্ল্যান্টের বিস্তারিত প্রকল্প রিরোর্ট (DPR) ও টেকনিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি মডেল প্ল্যান্ট বর্তমানে পূর্ণ ক্ষমতায় চালু রয়েছে এবং রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে আরও ৩৬টি প্রকল্পের নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

উন্নত অণুজীবঘটিত বায়োটেকনোলজির সঙ্গে স্বল্প খরচের প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব ইঞ্জিনিয়ারিঙের সমন্বয় ঘটিয়ে ডঃ পার্থ সারথী ঘোষাল ও তাঁর গবেষক দল প্রমাণ করেছেন যে গ্রামীণ স্যানিটেশন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ও সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের এই সফল রূপায়ণ এখন সারা ভারতের কাছে সম্পূর্ণ 'ODF Plus' লক্ষ্যমাত্রা এবং দীর্ঘস্থায়ী তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এক অনন্য জাতীয় দিশা হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

ভাবনা

আমার স্বপ্নের আগামী ভারত

স্বাধীনতা দিবসের দিনে দাঁড়িয়ে অষ্টম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী হিসেবে 'আগামীদিনে আমাদের দেশ ভারতকে আমি কেমন দেখতে চাই', সে বিষয়ে আমার ভাবনা ব্যক্ত করছি।

আগামী দিনে আমার স্বপ্নের ভারত হবে—

(১) শিক্ষায় আলোকিত এক বৈষম্যহীন সমাজ। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব শিশু যেন আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুও যেন শহরের মতোই উন্নত কম্পিউটার ল্যাব এবং প্রযুক্তিনির্ভর পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে থাকে। এমন এক ব্যবস্থা যেখানে জাতি, ধর্ম বা লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য থাকবে না। মানুষ শুধু মানুষের পরিচয়ে বাঁচবে।

(২) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মহাকাশে শ্রেষ্ঠত্ব এবং দূষণমুক্ত ভারত। আমাদের দেশ চিকিৎসা, বিজ্ঞান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে। আমাদের বিজ্ঞানী ও মহাকাশচারীরা চাঁদের মাটি পেরিয়ে আরও দূরের গ্রহে ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেবে। জলবায়ু দূষণের হাত থেকে বাঁচতে আগামী ভারত হবে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব। নদী ও অন্যান্য জলাশয় হবে প্লাস্টিকমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। কয়লা বা তেলের পরিবর্তে ভারতের প্রতিটি বাড়ি, গাড়ি ও কলকারখানা চলবে সৌরশক্তি ও বায়ুবিদ্যুতের ওপর নির্ভর করে।

(৩) আত্মনির্ভরতা ও দারিদ্র্যমুক্তি। ভারেতের তৈরি জিনিসপত্র সারা পৃথিবীর মানুষ ব্যবহার করবে। দেশীয় প্রযুক্তিতে দেশ পুরোপুরি আত্মনির্ভশীল হবে। ভারেতের কোনো শিশু, কোনো মানুষ যেন না খেয়ে ঘুমাতে না যায়। দেশের প্রতিটি মানুষের মাথা গোঁজবার ঠাঁই থাকবে।

(৪) নারীর নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন। আমার স্বপ্নের ভারতে মেয়েরা দিনেই হোক বা মাঝরাতে, যেকোনো সময়ে বা যেকোনো স্থানে সুরক্ষিত বোধ করবে। অর্থনীতি, রাজনীতি, খেলাধুলা ও প্রতিরক্ষায় মেয়েরাও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আজকে যারা শিশু বা কিশোর-কিশোরী, তারাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি আজ থেকেই নিজেদের চরিত্রগঠন করি, সৎ থাকি এবং দেশের আইন মেনে চলি, তবেই এই স্বপ্ন সফল হবে।

অস্মিতা ভৌমিক, অষ্টম শ্রেণী,
শিবপুর ভবানী বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া।

জাতীয় উদ্যান

তাডোবা

তাডোবা জাতীয় উদ্যান মহারাষ্ট্র রাজ্যের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম জাতীয় উদ্যান। এটি ৬২৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই উদ্যান নাগপুর থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রপুর জেলায় অবস্থিত। এই উদ্যানের নামকরণ করা হয়েছে আঞ্চলিক দেবতা তাডোবার নামে। এই উদ্যানের মধ্যে তাবোডা হ্রদ, তাবোডা নদী এবং কোলসা হ্রদ নামে তিনটি জলাশয় রয়েছে। এই জলাশয় তিনটিকে এই উদ্যানের জীবনরেখা বলা হয়। এই উদ্যানে প্রচুর স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ ও পাখি রয়েছে। বাঘ ছাড়াও এই উদ্যানে রয়েছে চিতাবাঘ, ডোরাকাটা হায়না, বনবিড়াল, বার্কিংডিয়ার, সম্বর ও চিত্রা হরিণ, কুমির, কোবরা, অজগর, ময়ূর, ঝুঁটিওয়ালা সর্প ঈগল-সহ অন্যান্য প্রাণী। বেশি পরিমাণে রয়েছে যেসব গাছগাছালি তার মধ্যে হলো— সেগুন, আইন, তেন্দু, হিরদা, মহুয়া মধুকা, করয়া গাম, অজুন ও বাঁশ। এই উদ্যানি ভ্রমণের সেরা সময় হলো ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২৭

সংখ্যা পাঠ

শতম্-১০০
সহস্রম্-১০০০
লক্ষ্যম্-১০০,০০০
প্রযুতম্-১০,০০,০০০
কোটি: - ১০০,০০০০০
অর্বুদম্ -১০,০০০০০০০
অব্জম্ -১০০,০০০০০০০
খর্বম্ - ১০০,০০০০০০০০
নিখর্বম্ -১০০০০০০০০০০০
মহাপদ্ম:-১০০০০০০০০০০০০
শঙ্কু: - ১০০০০০০০০০০০০০
জলধি:- ১০০০০০০০০০০০০০০
অন্ত্যম্ -১০০০০০০০০০০০০০০০
মধ্যম্- ১০০০০০০০০০০০০০০০০
পরার্ধম্ -১০০০০০০০০০০০০০০০০০

ভালো কথা

কাঠবেড়ালির ছানা

আমাদের বাড়ির ইলেক্ট্রিক মিটার বক্সের উপরে দুটো কাঠবেড়ালি খড়কুটো দিয়ে বাসা বেঁধে থাকত। আমার মা ওদের বিস্কুট, চিনে বাদাম খেতে দিত। সেদিন বাসার কাছে যেতেই চিঁ চিঁ শব্দ শুনে একটা চেয়ার এনে তার উপরে উঠে দেখি দুটো ছানা হয়েছে। লাল টুকটুকে, এখনো চোখ ফোটেনি। মায়ের দুধ খাচ্ছে আর ওদের বাবা একটু দূরে বসে আছে। আমাকে দেখেই খুব জোরে কিচ কিচ শব্দ করতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। আমি মাকে ছানা দুটোর কথা বললাম। মা এখন ওদের বাসার কাছে যেতে নিষেধ করলেন। ওরা ভয় পাবে তাই। আমি ভাবছি, কবে ওরা বড়ো হয়ে নেমে আসবে, তখন ওদের সঙ্গে খেলতে পারবো।

সীমা মহান্তি, সপ্তমশ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) তা ত্য গু ব
(২) প ড় কা থা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ক র দা বি হৃ য় দ
(২) রি ং কী স ন র্ত হ

২৪ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) অপশাসন (২) আতসবাজি

২৪ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) আপদেবিপদে (২) উন্নতিবিধান

(১) শ্রেয়ান রুইদাস, শ্যামপুর, হাওড়া। (২) কৃতিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, ইবি, মালদা। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল- ৪৯ (৪) কুহেলী বিশ্বাস, কালীবাড়ি, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

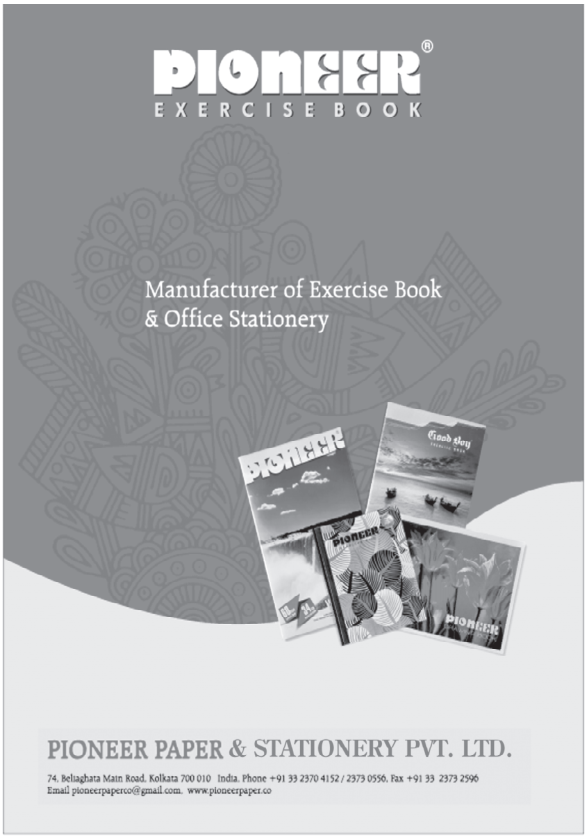

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঃ জাতীয়তাবোধের পুণ্যভূমি থেকে বাম-অতিবামপন্থী নৈরাজ্যের রক্তাক্ত বিবর্তন

ইতিহাস ও আদর্শের মহাসংকট

ডঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মানেই সংবাদ শিরোনামে ভেসে ওঠা মুহুর্মুহু ছাত্র সংঘর্ষ, বোমাবাজি, উপাচার্যদের দিনের পর দিন ঘেরাও করে রাখার সংস্কৃতি, কিংবা হোস্টেলের বদ্ধ অন্ধকারে ভয়াবহ র‍্যাগিং ও মাদকচক্রের চরম অরাজকতা। তবে এই ধ্বংসাত্মক রূপের নীচে চাপা পড়ে গেছে এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেবল কোনো ইট-পাথরের বিদ্যায়তন নয়; এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহত্তম, পবিত্রতম স্মারক। যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বুকে পদাঘাত করে, ভারতের নিজস্ব মেধা ও স্বদেশী ভাবনায় দেশকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে, আজ তা আন্তর্জাতিক শক্তির অঙ্গুলিহেলনে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির ধ্বংসাত্মক আদর্শগত চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে।

'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর সেই ত্যাগের ইতিহাস থেকে শুরু করে অতিবামপন্থী হিংসার আগ্রাসন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে আধুনিক কালের মাদকচক্রের বলি স্বপ্নদীপ কুণ্ডু বা অধ্যাপক সুমন নিহারের রহস্যজনক মৃত্যু— এই সুদীর্ঘ এক শতকের যাত্রাপথকে কাটাছেঁড়া করলে এক ভয়ঙ্কর রূপরেখা ফুটে ওঠে।

স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিগর্ভে জন্ম-ইতিহাস ঃ বঙ্গভঙ্গের রক্তরাঙা পটভূমি এবং ঔপনিবেশিক কার্লাইল সার্কুলার (১৯০৫-১৯০৬)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম-ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৯০৫ সালের অগ্নিগর্ভ বঙ্গে। ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় কার্জন যখন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করার কুখ্যাত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, তখন আপামর বাঙ্গালি গর্জে উঠেছিল এক অভূতপূর্ব প্রতিরোধে। শুরু হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন এবং বিলাতি পণ্য বয়কটের ডাক। সেই জোয়ার থেকে বাদ যায়নি এদেশের ছাত্রসমাজও। কলকাতার তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরুণ ছাত্ররা দলে দলে ব্রিটিশ-বিরোধী পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে শুরু করে এবং বিলাতি জিনিসপত্রের দোকানের সামনে পিকেটিং করতে থাকে।

যেমনটি ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার তাঁর গ্রন্থ 'দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯০৩-১৯০৮' (The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908)-এ অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, এই ছাত্র আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ রাজশক্তি এক চরম দমনমূলক পথ বেছে নেয়। ১৯০৫ সালের ২২ অক্টোবর তৎকালীন বঙ্গের মুখ্য সচিব আর.ডব্লিউ. কার্লাইল একটি অত্যন্ত গোপন ও দমনমূলক নির্দেশিকা জারি করেন,

যা ভারতের ইতিহাসে 'কার্লাইল সার্কুলার' (Carlyle Circular) নামে পরিচিত। এই কুখ্যাত সার্কুলারের মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোনো ছাত্র যদি সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেয় বা বিদেশি পণ্য বয়কটের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে তাদের বৃত্তি কেড়ে নেওয়া হবে, জরিমানা করা হবে, এমনকী প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হবে। বহু শিক্ষককেও চাকুরিচ্যুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ সরকারের এই দমননীতির প্রতিক্রিয়া কিন্তু উল্টো হলো। দেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন, ব্রিটিশদের তৈরি করা দাসত্বমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থেকে কোনোদিন স্বাধীন মানুষ গড়ে উঠতে পারে না। যেমনটি ১৯০৫ সালের নভেম্বর সংখ্যার ঐতিহাসিক বেঙ্গল গেজেট (Bengal Gazette) পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, এই ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার জন্য ভারতের নেতৃবৃন্দ এক সমান্তরাল, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (NCE–Bengal) ও স্বদেশী শিক্ষার মহাব্রত (১৯০৬) ঃ কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে ছাত্ররা দলে দলে ঔপনিবেশিক সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন করতে শুরু করলে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন। ১৯০৬ সালের ১১ মার্চ কলকাতার বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কক্ষে এক মহতী সভায় ভারতের শীর্ষস্থানীয় মনীষী ও জাতীয় নেতারা সমবেত হন। এই সভাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' বা 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল' (National Council of Education– Bengal)-এর।

যেমনটি ইতিহাসবিদ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইতিহাস (১৯০৬-১৯৫৬)'-এ উল্লেখ করেছেন—' এই পরিষদের মূল লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ জাতীয় নিয়ন্ত্রণে এবং জাতীয় স্বার্থে ভারতের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে মর্যাদা দিয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার এক সমন্বিত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এটি কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না, এটি ছিল ব্রিটিশদের প্রতি এক প্রকাশ্য অসামরিক অবাধ্যতা।'

এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ার পেছনে যে মনীষীদের অবদান ছিল, তাঁরা ভারতের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ স্যার রাসবিহারী ঘোষ। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন নোবেলজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ কুমারস্বামী এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীঅরবিন্দ ঃ প্রথম অধ্যক্ষ ও বিদ্যাপীঠের প্রাণপুরুষ

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে ১৯০৬ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতার ১২ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল'। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। কেমব্রিজ ফেরত শ্রীঅরবিন্দ তখন ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক। বিপ্লবী নেতা শ্রীঅরবিন্দকে কলেজের অধ্যক্ষ পদে বসানোর সিদ্ধান্তটিই প্রমাণ করে যে, এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য কেবল পুঁথিগত বিদ্যার্জন ছিল না, বরং তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নির্ভীক, দেশপ্রেমিক ও আত্মবিশ্বাসী জাতিগঠনের কারিগর তৈরি করা।

যেমনটি ঋষি অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক রচনাসমগ্র 'শ্রীঅরবিন্দ বার্থ সেন্টেনারি লাইব্রেরি' (Sri Aurobindo Birth Centenary Library)-তে সংরক্ষিত তাঁর নিজস্ব ডায়েরির রোজনামচায় স্পষ্ট দেখা যায়— তিনি এই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার মহান ঐতিহ্য ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে পাঠদানে যুক্ত হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-ঐতিহাসিক আনন্দ কুমারস্বামী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মহৎ উদ্যোগ দেখে তাঁর বিখ্যাত 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন— 'বহুদিন পর আজ বাঙ্গালি একটি সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে, যেখানে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের নিজেদের শিক্ষাদানের ভার আমরা হাতে তুলে নিয়েছি।'

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (BTI)-এর ভিত্তি স্থাপন ঃ বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সমান্তরালে ১৯০৬ সালের ২৫ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা--- 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (Bengal Technical Institute)। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতীয় শিক্ষার্থীদের এমন কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা যাতে দেশীয় শিল্প-ভিত্তি মজবুত হয় এবং ভারত বিদেশি পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বনির্ভর হতে পারে। ১৯১০ সালে এই কারিগরি ইনস্টিটিউটটি বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, যা পরবর্তীতে 'কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বেঙ্গল' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

যেমনটি বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নিজস্ব রৌপ্যজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন সিলভার জুবিলি ভলিউম ১৯৩১' (National Council of Education Silver Jubilee Volume 1931)-এ নথিভুক্ত করা হয়েছে--- 'এই কারিগরি অগ্রযাত্রার পেছনে ছিল দেশপ্রেমিক ধনকুবের ও জমিদারদের অকাতর আর্থিক অনুদান।' ১৯২১ সালে স্যার রাসবিহারী ঘোষ পরলোকগমন করার সময় তাঁর অর্জিত সম্পত্তির এক বিরাট অংশ— নগদ ১০ লক্ষ টাকা এবং আলিপুরের প্রাসাদোপম ভবনটি এই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটকে দান করে যান। এই বিপুল অর্থ দিয়ে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কলকাতার যাদবপুরে ১০০ বিঘা (প্রায় ৩৩ একর) জমি ক্রয় করে। ১৯২২ সালের ১১ মার্চ ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই নতুন ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, যার বিবরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বার্ষিক প্রতিবেদনে সংরক্ষিত আছে। ১৯২৪ সালে কলকাতার তৎকালীন মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দূরদর্শী নির্দেশনায় কলকাতা কর্পোরেশন এই জমিটি দীর্ঘমেয়াদি লিজে এই

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করে, যা 'কলিকাতা কর্পোরেশন মিনিট্‌স্ ১৯২৪'-এ স্পষ্ট উল্লেখে রয়েছে। ১৯২৪ সালে নবনির্মিত মূল ভবনের উদ্বোধন করা হয়। ভারতের মহান বিপ্লবী ও প্রথম অধ্যক্ষের স্মরণে নামকরণ করা হয়— 'অরবিন্দ ভবন'।

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, হীরালাল রায়, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যদের মতো খ্যাতনামা অধ্যাপকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠান ঔপনিবেশিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার খোলনলচে বদলে দিয়ে ভারতের নিজস্ব মেধার ওপর ভিত্তি করে এক আধুনিক কারিগরি বিপ্লবের সূচনা করে।

ত্রিগুণা সেন এবং ১৯৫৫ সালের ঐতিহাসিক রূপান্তর ঃ ভারতের স্বাধীনতার পর, ১৯৫৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আইন পাশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নামকরণ হয় আজকের 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'-এর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেক্টর বা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডঃ ত্রিগুণা সেন, যিনি পরবর্তীতে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ অত্যন্ত মহৎ ও উদার একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নতুনভাবে গঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে নিঃশর্তে দান করে দেয়, যার বিবরণ প্রদীপ কুমার ঘোষের 'হিস্ট্রি অফ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি (১৯৫৫-২০০৫)' গ্রন্থে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান অনুষদ গড়ে উঠেছিল বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমর্ত্য সেন, সুশোভন চন্দ্র সরকার এবং সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতো বিশ্বমানের পণ্ডিতদের হাত ধরে। স্বদেশী আন্দোলনের পুণ্য রক্ত ও ত্যাগের ওপর দাঁড়িয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা অর্ধশতকের মধ্যেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

ল্যাম্প ইন দ্য লোটাস ঃ একটি নতুন ও মহান প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন এক প্রতীকের, যা তার লক্ষ্য, আদর্শ এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম প্রিয় ছাত্র এবং ভারতীয় আধুনিক শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ শিল্পী নন্দলাল বসুকে। আচার্য নন্দলাল বসু যখন এই লোগো বা প্রতীকটি আঁকার কাজে হাত দেন, তখন তাঁর মাথায় ছিল এমন এক নকশা তৈরি করা যা কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয় দেবে না, বরং ভারতীয় দর্শনের গভীরতাকে ধারণ করবে। তিনি নকশার কেন্দ্রে রাখলেন একটি প্রদীপ, যার শিখা তিনটি ধারায় জ্বলছে। এই তিনটি শিখা প্রতীকায়িত করে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে। সেই প্রদীপটিকে তিনি ঘিরে দিলেন একটি শতদল পদ্মফুলের নকশা দিয়ে। ভারতীয় ঐতিহ্যে পদ্মফুল হলো বিকাশ, পবিত্রতা ও সৃজনশীলতার প্রতীক। ১৯৫৫ সালে আচার্য নন্দলাল বসু এই বিখ্যাত 'শতদল এমব্লেম' বা লোগোটির নকশা তৈরি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অফিশিয়াল নথিপত্র এবং সমাবর্তন উৎসবের সময় থেকেই এটি ব্যবহার করা শুরু হয়।

সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, হোস্টেল থেকে বহিরাগত ও বেআইনি প্রাক্তনীদের চিরতরে বহিষ্কার করা এবং জুটা-র আর্থিক ও অ্যাকাডেমিক দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এই পবিত্র বিদ্যাপীঠের শাপমোচন ঘটানো আজ অত্যন্ত জরুরি। নচেৎ, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মহান স্বপ্ন চিরতরে হারিয়ে যাবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

আনন্দ লাল, রমা প্রসাদ দে এবং অমৃতা সেন লিখিত 'দ্য ল্যাম্প ইন দ্য লোটাস : আ হিস্ট্রি অব যাদবপুর ইউনিভার্সিটি' (The Lamp in the Lotus : A History of Jadavpur University)-এই প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসগ্রন্থে এই প্রতীকের ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে স্মারক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কাদা থেকে জন্মেও পদ্ম যেমন আলো ও সৌন্দর্যের দিকে এগিয়ে যায়, তেমনই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরাও যেন অন্ধকার কাটিয়ে জ্ঞানের আলোয় বিশ্বমঞ্চে নিজেদের মেলে ধরতে পারে--- এটাই ছিল শিল্পী নন্দলাল বসুর ভাবনা।

বাম-অতিবামপন্থী আগ্রাসন ও বিদ্যাপীঠের অবক্ষয়— মাওবাদী ছায়া ও বিদ্যায়তনে হিংসার প্রবেশ (১৯৬৭-১৯৭০-এর দশক) ঃ ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতে শুরু করে। ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের ঢেউ কলকাতার কলেজ স্ট্রিট হয়ে খুব দ্রুত যাদবপুরের সবুজ ক্যাম্পাসে আছড়ে পড়ে। লালচীনের 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' এবং চীনা নেতা মাও-সে-তুং-এর উগ্র বামপন্থায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের একটি বড়ো অংশ সশস্ত্র বিপ্লবের মোহময় ফাঁদে পা দেয়। যেমনটি সমীরণ গুহর গ্রন্থ 'যাদবপুরের রক্তাক্ত দশক : নকশাল আন্দোলনের অন্ধকার দিক'-এ পাওয়া যায়, তৎকালীন যাদবপুরের তথাকথিত এলিট ছাত্ররা ধীরে ধীরে ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণাপত্র প্রচার এবং মাও-সে-তুং-এর আদর্শগত বশ্যতা স্বীকার করতে শুরু করে। ক্যাম্পাসের দেওয়ালে দেওয়ালে স্লোগান ওঠে— 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'।

এই সময়কালে জেইউএসও (Jadavpur University Students' Organisation) বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তার স্থান দখল করে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন (BPSF) এবং পরবর্তীতে আরও উগ্র বামপন্থী ছাত্র সংগঠন—প্রোগ্রেসিভ স্টুডেন্টস্ কো-অর্ডিনেশন কমিটি (PSCC)। এই উগ্রপন্থী ছাত্ররা শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা, উপাচার্যের ঘর ভাঙচুর করা এবং ক্যাম্পাসের ভেতরে বোমাবাজি করাকে 'বিপ্লবী সংস্কার' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেন হত্যা— এক নৃশংস অন্ধকার অধ্যায় (৩০ ডিসেম্বর,

১৯৭০) ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ অবক্ষয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত ও মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে ১৯৭০ সালের ৩০ ডিসেম্বর। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের চাকুরির শেষ দিন। পরদিনই তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল।

তৎকালীন উত্তাল পশ্চিমবঙ্গের অতিবামপন্থী ছাত্ররা দাবি তুলেছিল যে, পরীক্ষা বয়কট করতে হবে। কিন্তু অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন ছিলেন একজন আদর্শবাদী, দৃঢ়চেতা, জাতীয়তাবাদী শিক্ষক, যিনি ১৯৪০-এর দশক থেকেই যাদবপুরের কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে অধ্যাপক হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি এই অতিবাম ছাত্রদের চাপের মুখে মাথা নত করতে অস্বীকার করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন— যারা পরীক্ষা দিতে চান না, তারা বয়কট করতে পারেন, কিন্তু যেসব দরিদ্র ঘরের ছাত্র পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের স্বার্থে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবেই।

এই অপরাধে, ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যখন অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন তাঁর কার্যালয় থেকে হেঁটে অরবিন্দ ভবনের কাছে নিজের বাসভবনের দিকে ফিরছিলেন, তখন রাণা বসু নামক এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের নেতৃত্বে কয়েকজন মাওবাদী ক্যাডার পিছন থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে এবং ধারালো ছুরি দিয়ে ফুসফুস এফোঁড়-ওফোঁড় করে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষাবিদকে।

তৎকালীন উগ্রপন্থী মাওবাদীদের মুখপত্র 'ফ্রন্টিয়ার উইক্‌লি' (Frontier Weekly)-র ১৯৭১ সালের জানুয়ারি সংখ্যার বিশেষ সম্পাদকীয় এবং প্রখ্যাত গবেষক অমিত ভট্টাচার্যের দীর্ঘ পর্যালোচনা নিবন্ধ 'গোপাল সেন : দ্য মার্ডার অফ আ ভাইস-চ্যান্সেলর অন ক্যাম্পাস (Gopal Sen : The Murder of a Vice Chancellor on Campus)-এ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত রাণা বসু ছিলেন কলকাতার এক প্রখ্যাত বামপন্থী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অমিয়কুমার বসুর সন্তান। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত হয়ে রাজ্য পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেও, রানা বসুর অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও পারিবারিক প্রতিপত্তির কারণে সে দ্রুত জামিনে মুক্তি পেয়ে যায় এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও তৎকালীন রাজনৈতিক শক্তির মদতে গোপনে বিদেশে (কানাডায়) পাড়ি দেয়। পরবর্তীতে রাণা বসু যখনই ভারতে ফিরে এসেছে, সে দিব্যি যাদবপুর ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু দেশের কোনো আইন বা পুলিশ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি এই হত্যাকারীকে 'বিপ্লবী নায়ক' হিসেবে মহিমান্বিত করেছে, যা যাদবপুরের বুকে রাজনৈতিক হিংসার এক প্রাতিষ্ঠানিক লাইসেন্স এনে দেয়।

জুটা (JUTA)-র বাম রাজনৈতিক কবজা ঃ ১৯৭০-এর দশকের রক্তাক্ত অধ্যায়ের পর, ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার এক দীর্ঘমেয়াদি ছক কষা হয়। ১৯৯০ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একজন শিক্ষক যোগ দেন, যিনি ছিলেন সিপিএম এবং এসএফআই-এর অন্যতম শীর্ষ সংগঠক। তিনি যাদবপুরে পা দিয়েই শপথ করেছিলেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমস্ত জাতীয়তাবাদী ও ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষকদের ছেঁটে ফেলে কেবল সিপিএমের অনুগতদেরই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হবে।

এই সুপরিকল্পিত ছকের অংশ হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বা 'জুটা' (Jadavpur University Teachers' Association)-কে সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে কবজা করা হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩৫ বছরে জুটা এবং বামপন্থী উপাচার্যদের মাধ্যমে প্রায় বেশিরভাগ শিক্ষককে দলীয় আনুগত্য দেখে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আইআইটি বা বিদেশের নামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা যোগ্য জাতীয়তাবাদী গবেষকদের বাদ দিয়ে কেবল আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সুপারিশপ্রাপ্তদেরই শিক্ষকতার চেয়ারে বসানো হয়েছে। এটি আসলে ছিল একটি সুদূরপ্রসারী 'রাশিয়ান ছক' (Russian Scheme), যার উদ্দেশ্য ছিল একটি ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভেতর থেকে ভেঙে দিয়ে একটি কট্টর 'লাল দুর্গ'-এ পরিণত করা, ঠিক যেভাবে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়কে মতাদর্শগতভাবে কবজা করা হয়েছিল।

সিসিটিভি ক্যামেরা বিরোধী আন্দোলন এবং 'অন্ধকার স্বর্গ' গড়ে তোলার কৌশল ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী ও অতিবামপন্থী ছাত্র-শিক্ষক নেক্সাসের সবচেয়ে কুখ্যাত কৌশলটি হলো--- ক্যাম্পাসে সিসিটিভি (CCTV) ক্যামেরা বসানোর তীব্র ও হিংসাত্মক বিরোধিতা। ২০১০ সালে যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেশজুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং অসামাজিক কার্যকলাপ আটকাতে সিসিটিভি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তখন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি তার বিরুদ্ধে মারমুখী আন্দোলন গড়ে তোলে।

যেমনটি প্রখ্যাত সাংবাদিক সন্দীপন দেবের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কভার স্টোরি 'দ্য বার্থ অ্যান্ড স্প্রেড অফ আরবান নকশালস্ ইন ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমিয়া' (The Birth and spread of Urban Naxals in Indian Academia) যা 'স্বরাজ্য ম্যাগাজিন' (Swarajya Magazine)-এর সেপ্টেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এই বিরোধিতার পেছনে যুক্তি দেওয়া হয় 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' ও 'মুক্ত চিন্তার অঙ্গন'-এর তাত্ত্বিক প্রলেপ। কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরা না বসানোর আসল উদ্দেশ্য হলো ক্যাম্পাসের ভেতর এমন একটি 'অন্ধকার স্বর্গ' বা নো-গো জোন (No-Go Zone) তৈরি করে রাখা, যেখানে ভারতের আইনকানুন খাটবে না এবং যেখানে দাগি ও ফেরারি নকশাল ও জেহাদি নেতৃত্ব পুলিশের নজর এড়িয়ে ক্যাম্পাসে অবাধে আশ্রয় নিতে পারবে। এই কৃত্রিম অন্ধকারের আড়ালেই বছরের পর বছর ধরে চলেছে মাদক ব্যবসা, ছাত্রীদের ওপর যৌন নিগ্রহ এবং হোস্টেলের ভেতর র‌্যাগিঙের নারকীয় অত্যাচার।

স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর ট্র্যাজেডি— সমকামিতা এবং র‌্যাগিঙের বিষাক্ত কামড় (আগস্ট ২০২৩) ঃ সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকার এবং হোস্টেলের ভেতর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকার সবচেয়ে ভয়াবহ মূল্য দিতে হয়েছে নদীয়া জেলার বগুলা থেকে আসা এক অভাবী দরিদ্র আশাকর্মীর সন্তান ১৭ বছর বয়সি প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুকে। ২০২৩ সালের

৯ আগস্ট রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হোস্টেলের দ্বিতীয় তলার বারান্দা থেকে পড়ে স্বপ্নদীপের অত্যন্ত রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

যেমনটি 'দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া (The Times of India) এবং পিটিআই (PTI)-এর রিপোর্টে তৎকালীন সময়ে সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছিল, স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে তাকে বিবস্ত্র করে পৈশাচিক র‍্যাগিং করা হয়েছিল এবং তার শেষ আকুল আর্তনাদ ছিল— 'আমি সমকামী নই!' কালচারাল মার্ক্সিজম্-এর এক বিকৃত তত্ত্বকে ঢাল করে বহু বছর ধরে এক ধরনের সিন্ডিকেট চালায় হোস্টেলের ভেতর প্রাক্তন ও অবৈধ বিকৃতকাম ছাত্ররা; হোস্টেলের ভিতরে, বাইরে বিভিন্ন দেওয়ালে তারা আঁকে নানা অশ্লীল গ্রাফিতি, লেখে নানা রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী স্লোগান। এরা পড়াশোনা শেষ করেও বছরের পর বছর ধরে সেখানে বেআইনিভাবে হোস্টেলের ঘর দখল করে বসে ছিল; সেখানে তারা চালাত মদ-গাঁজার ঠেক। এছাড়া দরিদ্র ও গ্রাম থেকে আসা নতুন ছাত্রদের ওপর যৌন ও সমকামী মানসিক নির্যাতন চালাত।

এই ঘটনায় পুলিশ শেষপর্যন্ত ১৩ জন প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রকে গ্রেপ্তার করলেও, জুটা এবং এসএফআই-এর মতো প্রভাবশালী শিক্ষক-ছাত্র সংগঠনগুলি এই মামলাটিকে ধামাচাপা দিতে এবং সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্তকে বানচাল করতে কোমর বেঁধে নেমেছিল। সেইসঙ্গে স্বপ্নদীপের হত্যাকারীদের আড়াল করার জন্য তথাকথিত সুশীল সমাজ এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশ এক অদৃশ্য রক্ষাকবচ তৈরি করেছিল।

অধ্যাপক মহম্মদ সুমন নিহারের করুণ পরিণতি ও ক্যাম্পাসের মাদকচক্র ঃ যাদবপুরের মদ্যপ ও মাদক চালানকারীদের বিষাক্ত নেটওয়ার্ক কেবল ছাত্রদেরই ধ্বংস করেনি, কেড়ে নিয়েছে দরিদ্র ও সৎ শিক্ষকদের প্রাণও। মুর্শিদাবাদের এক অত্যন্ত প্রত্যন্ত ও দরিদ্র মুসলমান পরিবারের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত সন্তান মহম্মদ সুমন নিহার তাঁর অসামান্য মেধার জোরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ক্যাম্পাসের ভেতর রাত বাড়লেই যে মাদক ও মদ্যপানের আসর বসত, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মাদক সরবরাহকারী চক্রটির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

এর ফল হয়েছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। সুমন নিহারকে ক্যাম্পাসের ভেতর অতিবামপন্থী ছাত্র ও সমাজবিরোধীদের হাত থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় ভুয়ো শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনা হয়, যা যাদবপুরের ইতিহাসে অত্যন্ত চেনা একটি ছক। মানসিক অবসাদ ও লাগাতার অপমানের জেরে সুমন নিহার অবশেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পিয়ারলেস হসপিটালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি বারবার তাঁর পি এইচ ডি গাইড ডঃ জিষ্ণু বসুকে বলে গিয়েছিলেন— 'স্যার, যারা এই ক্যাম্পাসে ড্রাগের র‍্যাকেট চালায়, তাদের কিন্তু কোনো শাস্তি হলো না।' এই দরিদ্র শিক্ষকের করুণ মৃত্যুর খবর কলকাতার প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলি সযত্নে এড়িয়ে গেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর কনভয়ে হামলা এবং স্পেনের 'হিন্দোল মজুমদার' কানেকশন (মার্চ ২০২৫) ঃ ২০২৫ সালের ১ মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক অভাবনীয় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। রাজ্য সরকারি মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে আসা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় আল্ট্রা-লেফ্ট বা অতিবামপন্থী নকশাল ছাত্ররা। তারা মন্ত্রীর কনভয়ের পথ আটকে দাঁড়ায় এবং মন্ত্রীর গাড়ি যখন বের হতে যায়, তখন দুই ছাত্র আহত হয়েছে বলে এক বিপুল উত্তেজনা ছড়ানো হয়।

যেমনটি লালবাজার সদর দপ্তরের পুলিশি তদন্ত ও কেস ডায়েরি নম্বর ৪২/২০২৫-এ নথিভুক্ত রয়েছে, সেই তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ওই ঘটনায় রক্তাক্ত ছাত্রের যে ছবি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং ফোটোশপ্ড্। এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীদের কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং অরবিন্দ ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়।

এই ঘটনার পেছনে যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কাজ করছিল, তা প্রমাণিত হয় যখন কলকাতা পুলিশ স্পেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গবেষক ও যাদবপুরের প্রাক্তনী হিন্দোল মজুমদারকে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করে। গোয়েন্দাদের দাবি, হিন্দোল মজুমদার ইউরোপে বসে হোয়াট্স্অ্যাপ এবং অন্যান্য এনক্রিপ্টেড চ্যানেলের মাধ্যমে মার্চ মাসের এই বিশৃঙ্খলা ও উগ্র হামলাটির সম্পূর্ণ নীল নকশা তৈরি করেছিলেন এবং ভারতের মাটিতে অশান্তি ছড়াতে অর্থ সরবরাহ করেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, যাদবপুরের অতিবামপন্থী নেটওয়ার্ক কেবল কলকাতার অলিতে-গলিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইউরোপের বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক সার্কেলের সঙ্গে তার সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র রয়েছে।

টেস্টিং ল্যাবের আর্থিক কেলেঙ্কারি, পোস্তা ব্রিজ বিপর্যয় ও সিপিএমের অর্থভাণ্ডার ঃ সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সুদীপ্ত গুহ তাঁর দেওয়া একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি ভয়াবহ দুর্নীতির ওপর আলোকপাত করেছেন, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেন-দেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের টেস্টিং ল্যাব অত্যন্ত লাভজনক একটি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গের যেকোনো সেতু বা বহুতল তৈরি করতে গেলে তার সয়েল টেস্টিং (Soil Testing), কংক্রিট টেস্টিং বা স্ট্রাকচারাল ভেটিং (Structural Vetting)-এর জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র আবশ্যক।

পোস্তা উড়ালপুল বিপর্যয়ের সময় একটি বাজারি পত্রিকা এবং একটি ইংরেজি দৈনিকের বিশদ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে একটি দুর্নীতি চক্রের আবরণ উন্মোচন করা হয়েছিল। এই সংবাদপত্রগুলিতে উল্লেখিত হয়— ''অভিযোগ উঠেছে যে গত তিন দশক ধরে এই টেস্টিং ল্যাবকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করে রেখেছে সিপিএমপন্থী একদল অধ্যাপক। তারা কোনো প্রকৃত ল্যাব টেস্ট না করেই মোটা টাকার বিনিময়ে ঘরে বসে ভুয়ো 'ড্রাই টেস্টিং' বা ফিটনেস সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে।'' পোস্তা উড়ালপুল বিপর্যয়, যে ঘটনায় ৬০ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল তার ডিজাইন ও স্ট্রাকচারাল ভেটিং যিনি করেছিলেন, তিনি ছিলেন পরিবেশ বিদ্যায় মাস্টার্স করা একজন সিপিএমপন্থী অধ্যাপক--- যার আদৌ উড়ালপুলের মতো জটিল ভারী কাঠামোর ভেটিং করার কোনো যোগ্যতাই ছিল না। কিন্তু

দলীয় প্রভাবের কারণে তিনিই এই ভেটিং করেন এবং বিপর্যয়ের পর তিনি স্রেফ গা ঢাকা দেন।

এই ভুয়ো টেস্টিং ল্যাব থেকে যে কোটি কোটি টাকা প্রতি বছর আয় হয়, তার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে না গিয়ে সরাসরি সিপিএমের দলীয় ফান্ডে চলে যায়। বাম আমল চলে যাওয়ার পর রিকশাওয়ালা বা অটোওয়ালাদের থেকে তোলা আদায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি ও শিবপুর IIEST-র টেস্টিং ল্যাবগুলিই হলো উগ্র বামপন্থী রাজনীতির অন্যতম প্রধান আর্থিক উৎস। এই টাকার উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়েই তারা ক্যাম্পাসে কোনো অরাজনৈতিক শক্তি বা সরকারি সিসিটিভি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে দিতে চান না।

২০২৬ সালের সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও 'দিমাগি নকশাল'দের নবতম জেহাদঃ ২০২৬ সালের আগস্ট মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। গত ১৯ আগস্ট রাতে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র সংসদের (ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন বা ফেটসু-র) সাধারণ সভা বা জেনারেল বডি (GB) মিটিংকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। রাজ্য সরকারের নীতি অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোনো বৈধ ছাত্র সংসদের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও গোপনে, সম্পূর্ণ অননুমোদিত ও বেআইনিভাবে রাত ১-৩০টার দিকে এই সভার আয়োজন করা হয়। অভিযোগ ওঠে, এই সভায় বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্ররা মা সরস্বতী ও সনাতন সংস্কৃতির চরম অবমাননাকর চিত্র প্রদর্শন করে এবং ভারত-বিরোধী স্লোগান তোলে। সেখানে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদি', 'ফ্রি প্যালেস্তাইন'- এর মতো সমাজবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান তোলা নিয়ে যখন সাধারণ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা প্রশ্ন তোলেন, তখন 'ফ্যাসিবাদী' বলে দাগিয়ে দিয়ে তাঁদের ওপর লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়। এই পৈশাচিক হামলায় দীপ্তিমান, সুব্রত, অর্ণব, পবিত্র, সঞ্জীবন, শুভজিৎ ও নিখিল দাসের মতো বেশ কয়েকজন ছাত্র ও গবেষক গুরুতর আহত হন। এমনকী এক ছাত্রের চোখে মারাত্মক আঘাত করে চিরতরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিশৃঙ্খলা যখন চরমে পৌঁছায়, তখন আক্রান্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, সহ-উপাচার্য অমিতাভ দত্ত এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডল— সবাই নিজেদের মোবাইল ফোন বন্ধ করে ক্যাম্পাস ছেড়ে গা ঢাকা দেন। এই চরম প্রশাসনিক শূন্যতার মুখে অসীম মিত্র ও ভাস্কর সর্দারের মতো শিক্ষকেরা রাত ১১টায় প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ বুদ্ধদেব সাউয়ের আবাসে ছুটে যান। ডঃ সাউ মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে পৌনে বারোটা নাগাদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় উত্তেজিত পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং সে রাতে বড়ো ধরনের কোনো রক্তপাত বা প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়।

গত ২০ আগস্ট রাতে সহ-উপাচার্য অমিতাভ দত্ত একটি নোটিশ জারি করে ২১ আগস্টের দ্বিতীয়ার্ধের পরীক্ষা বাতিল করে দেন। শিক্ষকদের একাংশের দাবি, ২১ আগস্ট বিকাল ৪টায় বামেদের প্রাক-পরিকল্পিত মিছিলে ছাত্রদের উপস্থিতি বাড়াতেই অত্যন্ত পক্ষপাতমূলকভাবে এই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যা ছাত্রস্বার্থের চরম বিরোধী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তাঁর মাধ্যমে সিসিটিভি ক্যামেরার বিভিন্ন ফুটেজ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের কাছে নানাভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে।

এই ফুটেজগুলিকে সেই সংবাদমাধ্যমগুলির দ্বারা অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে বাম ও অতিবামেদের ভিক্টিম কার্ড খেলার ন্যারেটিভ তৈরিতে। শ্রীঅরবিন্দ ও আচার্য নন্দলাল বসুর স্মৃতিকে উসকে দিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের এই ঘটনায় দোষী সাজানোর ন্যারেটিভ খাড়া করে আরবান নকশাল প্রভাবিত সংবাদমাধ্যম। অথচ শ্রীঅরবিন্দ ও আচার্য নন্দলালের আদর্শকে যে গত ৫০ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ধ্বংস করা হচ্ছে— সে বিষয়টি কোনোদিন সম্প্রচার করেনি তারা। গত ১৫ বছর ধরে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত থেকে বর্তমানে অপসারিত তৃণমূলনেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় মন্তব্য করে রাজ্য রাজনীতিতে ফের প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার সেই বাম ও অতিবামপন্থীদের পাশে থাকার বার্তা সোৎসাহে সম্প্রচার করেছে বামপন্থী সংবাদমাধ্যম।

আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এক গভীর বৈপরীত্যের প্রতীক। একদিকে ভারতের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখে অ্যাকাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার লড়াই--- অন্যদিকে শতাব্দীপ্রাচীন জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তিকে বুটজুতো দিয়ে মাড়িয়ে চীনের রেড বুক এবং মাওবাদী হিংসার সোপান বেয়ে ক্যাম্পাসকে একটি ভারতীয় আইন ও সংবিধানের শাসনহীন 'মুক্তাঞ্চল' বা 'নো-গো জোন'-এ পরিণত করার মরিয়া চেষ্টায় জুটা ও অতিবামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির এই 'দিমাগি নকশাল' নেক্সাস।

বিদ্যাপীঠের শাপমোচনের আহ্বান ঃ যে মাটি ছুঁয়ে গিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যে ভবনের ধুলোয় মিশে আছে ঋষি অরবিন্দের পদচিহ্ন, যাকে ভালোবেসে নিজের সর্বস্ব সম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ— আজ সেই পবিত্র প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, মাওবাদী স্লোগান দিয়ে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার শপথ নেওয়া হয়, মাদক পাচার করা হয় এবং দরিদ্র পরিবারের মেধাবী সুমন নিহার বা স্বপ্নদীপ কুণ্ডুদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়।

এই চরম প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় রুখতে হলে কেবল অপরাধী ছাত্রদের গ্রেপ্তার বা প্রশাসনের ওপর দোষারোপ করাই যথেষ্ট নয়। এই সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের সাধারণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে এই বাম ও অতিবামপন্থী রাজনীতির ভয়াবহ, বিষাক্ত জাল থেকে মুক্ত করতেই হবে।

সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, হোস্টেল থেকে বহিরাগত ও বেআইনি প্রাক্তনীদের চিরতরে বহিষ্কার করা এবং জুটা-র আর্থিক ও অ্যাকাডেমিক দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এই পবিত্র বিদ্যাপীঠের শাপমোচন ঘটানো আজ অত্যন্ত জরুরি। নচেৎ, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সেই মহান স্বপ্ন চিরতরে হারিয়ে যাবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। □

পরলোকে কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সভাপতি

এ বালকৃষ্ণন

বিবেকানন্দ শিলা স্মারক ও বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারী-র সভাপতি এ বালকৃষ্ণন গত ২৬ আগস্ট পরলোকগমন করেন। ২৯ আগস্ট তাঁর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কন্যাকুমারীতে শত শত মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। কেরলমের অধিবাসী বালকৃষ্ণনের জনসেবা ও সমাজসেবার প্রধান কেন্দ্র ছিল কন্যাকুমারী। তিনি ১৯৩৮ সালের ৩ মে সুদূর দক্ষিণের কেরলম্ রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে বিমানবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পরে বিবেকানন্দ শিলা স্মারকের স্থপতি একনাথ রানাডের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিবেকানন্দ কেন্দ্রে যোগদান করেন। সাংসারিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে তিনি বিবেকানন্দ কেন্দ্রের জীবনব্রতী কার্যকর্তা রূপে দেশ ও সমাজের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেন। তিনি বিবেকানন্দ কেন্দ্রের জীবনব্রতী কার্যকর্তাদের প্রথম ব্যাচের সদস্যদের মধ্যে অন্যতম। একনাথজীর আহ্বানে ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় তিনি ভারতের প্রান্তে প্রান্তে গিয়ে জনসাধারণের সেবা ও তাঁদের নিদ্রিত আত্মাকে জাগ্রত করার পবিত্র ব্রত ধারণ করেন।

১৯৭৪ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জোনাল অর্গানাইজার হিসেবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন কাজের মধ্যে অন্যতম হলো অরুণাচল প্রদেশে বিবেকানন্দ কেন্দ্র পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের স্থাপনা। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করা বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয় আজ উত্তর পূর্ব ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম।

১৯৮১ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত তিনি বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি কেন্দ্রের সভাপতির দায়িত্বভার পালন করেছেন। ২০১৪ সালে অরুণাচল প্রদেশে শিক্ষার প্রসারে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকার জন্য অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য সরকার তাঁকে বিশেষ সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত করে।

তাঁর সাদাসিধে, অনুশাসিত, নিঃস্বার্থ জীবন সারা দেশে হাজার হাজার কার্যকর্তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাঁর পবিত্র জীবন ও কর্মকাণ্ড বহু মানুষকে প্রেরণা জোগাবে। তাঁর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শোক জ্ঞাপন করে বলেছেন, 'উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে তাঁর বিশেষ গভীর সম্পর্ক ছিল। শৈক্ষিক, সামাজিক ও রাষ্ট্র-নির্মাণমূলক কর্মকাণ্ডে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিবেকানন্দ কেন্দ্র পরিবার ও তাঁর গুণানুরাগীদের উদ্দেশে আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে গভীর শোক জ্ঞাপন করছি।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইন তাঁর মৃত্যুতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে-সহ বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন তাঁর মৃত্যুতে শোকবার্তা জ্ঞাপন করেছেন।

শ্রীবালকৃষ্ণন তাঁর জীবনের পাঁচ দশকেরও বেশি সময় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ও সমাজ সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের প্রথমদিকের জীবনব্রতীদের একজন হিসেবে তিনি সারাদেশে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সর্বোচ্চ পদে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপন, নম্রতা এবং সমস্ত কাজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমা স্মরণে কলকাতা থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যে ঐতিহাসিক যাত্রা হয়েছিল তাতে তিনিও ২৪৭ দিনে প্রায় ২২ হাজার পথ পরিক্রমা করেছিলেন। □

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩৩

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোটো গল্প
প্রবন্ধ

সত্বর আপনার কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা